বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE-৩০৩

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE - ৩০৩

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ রবীন্দ্রজীবন প্রথম পর্ব (১৮৬১-১৮৮১)

একক–১ : রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবার

একক–২ : রবীন্দ্রনাথ ও বহির্জগৎ

একক–৩ : রবীন্দ্রনাথ ও 'ভারতী' পর্ব

একক–৪ : রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ রবীন্দ্রজীবন দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮১-১৯০১)

একক–৫ : রবীন্দ্রনাথ ও 'তত্ত্ববোধিনী', 'বালক' পত্রিকা

একক–৬ : রবীন্দ্রনাথ : 'মানসী' ও 'শিলাইদহ' পর্ব

একক–৭ : রবীন্দ্রনাথ ও 'হিতবাদী', 'সাধনা' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকা

একক–৮ : রবীন্দ্রনাথ ও 'সোনার তরী' পর্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ রবীন্দ্রজীবন তৃতীয় পর্ব (১৯০১-১৯২১)

একক–৯ : শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০১)

একক–১০ : গীতাঞ্জলির প্রেক্ষাপট ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (১৯১৩-১৯১৪)

একক–১১ : রবীন্দ্রনাথ : সবুজপত্র পর্ব (১৯১৪)

একক–১২ : জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সমকালীন দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রবীন্দ্র কবিসত্তা (১৯১৮-১৯২০)

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ রবীন্দ্রজীবন চতুর্থ পর্ব (১৯২১-১৯৪১)

একক–১৩ : লিপিকার রচনাবলী ও সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ

একক–১৪ : পূরবী কাব্যের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনায় (১৯২৪) অবস্থানকালে সাহিত্য-শিল্পকলা বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাভাবনা

একক–১৫ : বিশ্বসভায় বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ

একক–১৬ : দার্শনিকসত্তা ও কবিসত্তার সম্মিলনে রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশক (১৯৩০-১৯৪১)

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : ডিএসই/DSE-৩০৩

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

বিশেষ পত্র-৩০৩	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবার	১-১১
	২	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও বহির্জগৎ	১২-১৮
	৩	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও 'ভারতী' পর্ব	১৯-২৩
	৪	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	২৪-২৯
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও 'তত্ত্ববোধিনী', 'বালক' পত্রিকা	৩০-৩৪
	৬	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ : 'মানসী' ও 'শিলাইদহ' পর্ব	৩৫-৩৯
	৭	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও 'হিতবাদী', 'সাধনা' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকা	৪০-৪৪
	৮	ড. তুষার পটুয়া	রবীন্দ্রনাথ ও 'সোনার তরী' পর্ব	৪৫-৪৯
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০১)	৫০-৫২
	১০	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	গীতাঞ্জলির প্রেক্ষাপট ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (১৯১৩-১৯১৪)	৫৩-৫৬
	১১	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথ : সবুজপত্র পর্ব (১৯১৪)	৫৭-৬৪
	১২	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সমকালীন দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রবীন্দ্র কবিসত্তা (১৯১৮-১৯২০)	৬৫-৭১
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	লিপিকার রচনাবলী ও সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ	৭২-৭৬
	১৪	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পূরবী কাব্যের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনায় (১৯২৪) অবস্থানকালে সাহিত্য-শিল্পকলা বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাভাবনা	৭৭-৮৯
	১৫	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	বিশ্বসভায় বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ	৮০-৯১
	১৬	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	দার্শনিকসত্তা ও কবিসত্তার সম্মিলনে রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশক (১৯৩০-১৯৪১)	৯২-১০০

পর্যায় - ১
রবীন্দ্রজীবন : প্রথম পর্ব (১৮৬১-১৮৮১)

একক - ১
রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবার

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.১.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.১.২ : ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

৩০৩.১.১.৩ : রবীন্দ্রনাথের জন্মমুহূর্তে ঠাকুরপরিবার

৩০৩.১.১.৪ : বংশতালিকা

৩০৩.১.১.৫ : গৃহশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ

৩০৩.১.১.৬ : উপসংহার

৩০৩.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.১.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.১.১.১ : ভূমিকা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'মাসিক বসুমতী' (বৈশাখ, ১৩৬১)পত্রিকায় 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টির পথে রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিব্যক্তি লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু তাঁর জীবনের মূল সূত্র ছিল এক ধ্যানমগ্ন তপস্যা ও কঠোর সাধনার গভীরে নিহিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের এই জীবনব্যাপী নিরলস সাধনাকে চিরদিন প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মত কখনো কখনো সেই অন্তর্গূঢ় সাধনা প্রকাশ পেয়েছে এবং তার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য ঘটেছে অনেকের জীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই মর্মগত সাধনার সঙ্গে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের বাণীকে মিলিয়ে দেখতে পারলে

তবেই তাঁর পূর্ণ পরিচয়ের সঙ্কেত পাওয়া সম্ভবপর।' এই কাজটি তখনই সম্ভব যখন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যজগতের পাশাপাশি বিচিত্র জীবনকে মিলিয়ে দেখতে পাই। রবীন্দ্রজীবনী বলতে আমরা কবির জীবনী যে ধারায় গঠিত হয়েছিল বা রচিত হয়েছিল সেই ক্রমপরম্পরার স্তরগুলির খোঁজ করতে পারি। আনন্দ উজ্জ্বল উপস্থিতির পাশপাশি সুগভীর দুঃখ ও বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে তিনি চলেছিলেন আপন পথে। সেই পথের সন্ধান করতে চাই আমরা। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষার কবি নন; তিনি সমগ্র মানবসংসারের ও মানবজগতের কবি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর কবি। তাঁকে কোনো সময় কাল বা স্থানের সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় না; তিনি চিরকালীন; বলা বাহুল্য তিনি সর্বকালের মানবমনের কবি। 'বাবাকে যেমন দেখেছি'-তে রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ঋষি। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাকে সম্যক বিশ্লেষণ করার যত চেষ্টাই হোক না কেন, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সবটুকু রহস্য আয়ত্ত করা যায় না, কারণ সচরাচর আমরা মানুষকে বিচার করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকি, এ ক্ষেত্রে তা অচল।' (পৃ ৫১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভগবৎ উপাসনা করে কনিষ্ঠপুত্রের নামকরণ করেন 'রবীন্দ্রনাথ'। অসিত কুমার হালদার বলেছেন(রবিতীর্থে গ্রন্থে, পৃ ১), নামকরণের সময় মহর্ষি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, "এই শিশুর নাম 'রবীন্দ্রনাথ' রাখা হোল, এঁর চারধারে স্থাপিত দীপ শ্রেণীর মতই ইনি উজ্জ্বল প্রতিভায় জগৎ উদ্ভাসিত করবেন এবং ধূপবাসিত এই কক্ষের মত এঁর যশ-গৌরব জগতে বিস্তারিত হবে।" কবি রবীন্দ্রনাথ 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে বলেছেন কবিপুত্র টেনিসনের পরলোকপ্রাপ্তির পর দুইখণ্ডে জীবনী প্রকাশ করলেও টেনিসনের জীবনচরিত হয়েছে হয়তো; কিন্তু কবির জীবনচরিত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ 'কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে। যাঁহারা কর্মবীর, তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। ... তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।' অর্থাৎ জীবনচরিতের মধ্যে কোনো মহাপুরুষকে পেতে পারি, ব্যক্তি মানুষকে পাওয়া সম্ভব নয়; বরং কাব্যে বা সৃষ্টিতে প্রকৃতই মহাকবিকে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ যিনি কবি তাঁর প্রতিদিনের ভাবনার নিত্যরূপ ধরা থাকে রচনায়, সৃষ্টিতে। তাই জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রচনার পরিচয়ও আমাদের এই সূত্রে ভীষণ প্রত্যাশিত বিষয়। 'উৎসর্গ' কাব্যের ২১ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

'বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।'

জীবনচরিত কেউ সঠিকভাবে লিখতে পারে এই বিশ্বাস কবির ছিল না। আত্মজীবনীতেও রবীন্দ্রনাথ সেই আক্ষেপ করেছেন। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কবিসত্তাকে এক করে দেখবার বাসনা তাঁর কোনো কালেই ছিল না। কবির ব্যক্তি জীবনের বাইরে যে সৃষ্টিশীল মন আছে সেই প্রকাশের দিকেও তাঁর অন্বেষণ ছিল সদাজাগ্রত।

৩০৩.১.১.২ : ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সর্বসাধারণের কাছে একটি দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে উঠেছিল। বাঙালিজাতি এবং সমাজ তার ফলে আশায় বুক বেঁধেছিল। ঠাকুরপরিবারের মানুষজন ও তাদের আদবকায়দা এককথায় সমগ্র জাতির কাছে অত্যন্ত রুচিশীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রথা প্রভৃতি জীবনের সমস্ত ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। এইরকম একটি পরিবারের দীর্ঘ ইতিহাস থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

৮০ বছরেরও দীর্ঘ জীবন নিয়ে ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। এই পরিবারের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বলতম একটি নক্ষত্র হিসেবেই বিবেচিত ছিলেন। পরিবারে অনেকেই বিচক্ষণ থাকলেও ঠাকুরপরিবারের এই নামডাক রবীন্দ্রনাথের জন্যই একথা বলাই বাহুল্য। রবি থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন যে পারিবারিক পরিসর ও পরিমণ্ডলে তার সংক্ষিপ্তচর্চা এক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি। কীভাবে একজন মানুষ সুদূর যশোহর থেকে আদি কলকাতায় এসে ধন-সম্পদ মান মর্যাদা প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করলেন সেই ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠাকে বুঝতে তাই ঠাকুরপরিবারের সাংস্কৃতিক পরিচয় এক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। বাংলাদেশে বিভিন্ন থাকগুলি নানান যবনদোশে দুষ্ট হয়েছিল, যেমন'সেরখানী', 'পিরালী', 'শ্রীমন্তখানী' প্রভৃতি। এই পিরালী বংশের কথা বলতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'(ব্রাহ্মণ কাণ্ড, পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কামদেব ও জয়দেব দুই ভাইয়ের সময় থেকেই এই মুসলমানযোগ তৈরি হয়। সেই কারণে কবির বংশধরদের প্রতি এই কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত হয় নিরন্তর, যে কারণে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ব্রাত্য' মনে করতেন। রামগোপালের পুত্র জগন্নাথ কুশারী ঠাকুর-বংশের আদিপুরুষ। তিনি আদিপিরালী শুকদেব রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিয়ে করেন। তাঁর চার পুত্রপ্রিয়ঙ্কর, পুরুষোত্তম, হৃষীকেশ ও মনোহর। এর মধ্যে পুরুষোত্তম কুশারীর পুত্র বলরাম ও তঁর পুত্র হরিহর ও তাঁর পুত্র রামানন্দ। রামানন্দের দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ মহেশ্বর ও কনিষ্ঠ শুকদেব। মহেশ্বরের থেকে আসে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার, জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার ঠাকুর-গোষ্ঠীর এবং শুকদেব-এর বংশতালিকা থেকে আসে চোরবাগানের ঠাকুরগোষ্ঠীর কথা। কথিত আছে মহেশ্বর ও তাঁর পুত্র জাতিকলহের কারণে পুত্র পঞ্চাননকে নিয়ে কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন। শুকদেবও পরে একই কারণে সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

স্থানটিতে জেলে, মালো ও কৈবর্তদের বাস ছিল; তাই নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে ব্রাহ্মণদের সাধারণ সম্বোধন 'ঠকুর' প্রচলিত হয়। সুতরাং পঞ্চানন কুশারী ক্রমে 'ঠাকুর' সম্বোধনে পরিচিত হলেন বেশি করে। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ। উভয়েই আমিনীকার্যে বহু অর্থ উপার্জন করে কলকাতার দক্ষিণের অনেকটা অংশ ক্রয় করেন। জয়রামের চারটি পুত্র ও একটি কন্যার কথা জানা যায় আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম এবং কন্যার নাম সিদ্ধেশ্বরী। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ নীলমণি ঠাকুর। জয়রাম ঠাকুরের চার পুত্র আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। এই জয়রামের মৃত্যুর পরই ঠাকুর পরিবারের বাসস্থান পরিবর্তিত হয়। নীলমণি এই পরিবারবর্গের অভিভাবক হন। এই নীলমণি ঠাকুর ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে চাকরি করতেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ নতুন দেওয়ান হয়ে এলে নীলমণি উড়িষ্যার কালেক্টরের সেরেস্তাদার হয়ে উড়িষ্যা যান। এই নীলমণি উড়িষ্যায় যে অর্থ উপার্জন করতেন তা কলকাতায় অভিভাবক হয়ে থাকা দর্পনারায়ণের কাছে প্রেরণ করতেন। সেই সময় জয়রামের পুত্র গোবিন্দরামের অনুপস্থিতিতে বিধবা স্ত্রী রামপ্রিয়া সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে সম্পত্তি ভাগ করে নেন। এইভাবে নীলমণি উড়িষ্যায় চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে ১৭৮৪ সালের জুন মাসে জোড়াসাঁকোর মেছুয়াবাজার এলাকায় ঠাকুরপরিবারের বাসস্থান নির্মাণ করেন।

তাঁর তিন পুত্র—রামলোচন, রামমণি, ও রামবল্লভ এবং এক কন্যাকমলমণি ছিল। নীলমণি ঠাকুরের মৃত্যুর পর রামলোচন ঠাকুর পরিবারের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। এই রামলোচন পিতৃদেবের মতো বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি অনেক জমি সম্পত্তি ক্রয় করে পরিবারের গৌরব ও ঐশর্য বৃদ্ধি করেন। শিবসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করলেও জন্মের কিছুকাল পরেই তার মৃত্যু হলে রামলোচন মধ্যম ভ্রাতার পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। ১৮০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর রামলোচন মারা যাওয়ার সময় দ্বারকানাথের বয়স তখন ১৩ বছর। মাতা অলকাসুন্দরী ও সহোদরদের সহায়তায় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকাল থেকে গুরুমশায় ও মৌলবীর কাছে উত্তমরূপে ইংরেজি ও পারসী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি রামমোহন রায়ের সহচর ছিলেন। ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীর হয়ে তিনি রেশম ও নীলদ্রব্যের কারবার করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুকৌশলী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী মানুষ। মান্যগণ্য ও সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিগণের সুনজরে ও বিশ্বাসভাজন হওয়ার কারণে তিনি উন্নতির জোয়ার এনেছিলেন। দ্বারকানাথ পৈত্রিক জমিদারি বিরাহিমপুর থেকে বৃদ্ধি করে কালীগ্রাম, সাজাদপুর, শিলাইদহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। দ্বারকানাথ এর পাশাপাশি নানান সামাজিক হিতকর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—হিন্দু কলেজ স্থাপন, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, সতীদাহ-নিবারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ সালে ৫১ বছর বয়সে দ্বিতীয়বারের জন্যে বিলাতে গিয়ে ১ অগস্ট তাঁর মৃতু হয়। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী দ্বারকানাথ আরবী ফারসী ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার কারণে তিনি খুব সহজেই সমাজে ও ইংরেজদের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৮২৯ সালে তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৩০ সালে কালীগ্রামে ও ১৮৩৪ সালে সাহাজাদপুর পরগণায় জমিদারি ক্রয় করেন।

শুধু অর্থ উপার্জন দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না; দেশ ও সমাজের উন্নতিমূলক কাজে হাত বাড়ীয়ে দিয়েছিলেন রামমোহনের দিকে। তাই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে দু'জনেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮১৭ সালের ২৩ জানুয়ারী গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ সালে পাশ্চাত্য প্রথায় চিকিৎসাবিদ্যার জন্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে দেশীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্যে দ্বারকানাথ তিন বছরের জন্য বাৎসরিক ২ হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করেন। হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ প্রথা নিবারণে দ্বারকানাথ রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন মুক্ত হস্তের মানুষ। ঠাকুরপরিবার যে অর্থ, সম্পত্তি, আভিজাত্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলো তাঁর কেন্দ্রে ছিলেন তিনি।

১৮০৯ সালে যশোহরের নরেন্দ্রপুরের রামতনু চৌধুরীর কন্যা দিগম্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় ও ১৮৩৯ সালে তিনি মারা যান। পাঁচ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), নরেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪), ভূপেন্দ্রনাথ (?-১৮৩৯) ও নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-৫৮)। মাত্র ৫২ বছর বয়সে ২-য় বার বিলাত ভ্রমণে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। দ্বারকানাথ প্রথম দিকে বৈষ্ণব ছিলেন। বাড়িতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী পূজার বিলাসী আয়োজন চলত। এগুলি ছাড়াও তখন বাড়িতে নানান উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেতো। তাঁর পাঁচ পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রসমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকরূপে ও 'মহর্ষি' নামে সুপরিচিত এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। যদিও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ধন মান মর্যাদা এসেছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাল থেকেই কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরপরই মহর্ষি পিতার ঋণ নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েন। ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে প্রায় সমস্ত কিছু বিক্রি করে; এমনকি নিজের হাতের আংটিও পর্যন্ত বিক্রি করে পিতার দ্বারা প্রতিশ্রুত দানের ও ঋণের টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করে দেন। তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা সম্পাদন ও ধর্মসভা গঠনের মতো নানান জনহিতকর কর্মে উৎসাহী ছিলেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং একথা অনায়াসেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ঠাকুর পরিবার ছিল একটি নিতান্তই সম্ভ্রান্ত পরিবার।

৩০৩.১.১.৩ : রবীন্দ্রনাথের জন্মমুহূর্তে ঠাকুরপরিবার

১৮৬১ সালের ৭ মে বাংলা ২৫ শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে কলকাতার ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক বাড়িতে কবির জন্ম হয়। পিতা মহর্ষি ও মাতা সারদা দেবীর পনেরোটি সন্তানের মধে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর জন্মের সময় তখন সেই পরিবার ছিল নানান সংকট ও সমস্যার মধ্যে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পতির ভাগ নিয়ে সমস্যা তার অন্যতম একটি। রবীন্দ্রনাথের জন্মমুহূর্তে বাংলা দেশে ও সমাজে নানান ধারার মুক্তির বাণী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ১৮৬১ সালেই বঙ্কিম যুগ শুরু হয়। প্রথাগত সাহিত্য ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসে যায়। ঠাকুরবাড়িতে বালক দেখতে পান সমকালের সম্ভ্রান্তবাড়ির একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে। নিজেও কিছুটা উপলব্ধি করেন গৃহবন্দী থেকে। সারদাদেবীর ১৫টি সন্তান। মহর্ষি কলকাতায় অল্পই থাকতেন। এতবড়ো সংসার দেখাশুনার ভার ছিল মায়ের উপর। ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে নজর দিতে পারতেন না। তখন ঠাকুরবাড়িতে একটি বিশেষ আদব কায়দার জোয়ার। কথায় বার্তায় চলনে বলনে বাড়ির বাতাস ছিল পূর্ণ। হিন্দু মেলা, সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে স্বাদেশিকতার ডাক পৌঁছে গিয়েছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরে। পাশাপাশি চলতে থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশ। সেই সূত্রে অনেকের গুণী মানুষের, পণ্ডিতের যাতায়াত। সকলকে দেখে বুঝে উঠতেই সময় চলে যেতে থাকে বালকের। একসময় কবি বিহারীলালকে দেখে তাঁর মনে হয় কবি হলে এমনই কবি হবেন, বঙ্কিমের কথা শুনে তাঁর মনে হয়, সমালোচক হলে এমনই হবেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যু পর বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সমাপ্তি হলেও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত(১৮৫৮) দুর্গোৎসব সমভাবে সম্পন্ন হতো। মহর্ষি এই পূজার সময় বাইরেই থাকতেন। তাঁর ১ম দুই পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ এবং কন্যার (সৌদামিনী) বিবাহ কুলপ্রথানুসারে সম্পন্ন করেছিলেন রমানাথ ঠাকুর। মহর্ষি ২য় কন্যা সুকুমারীর বিবাহকালে(১২ই শ্রাবণ ১২৬৮, ১৮৬১ সাল) ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন আনেন। পৌত্তলিকতা বন্ধ করার জন্যে তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, শালগ্রামশিলা, গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করে বিবাহের ভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতির সংকলন করেন। বাড়িতে ছিল সাংস্কৃতিক আবহাওয়া। অগ্রজদের কেউ কেউ লিখছেন—প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, প্রহসন প্রভৃতি। বাঁধা গায়ক ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট প্রমুখজন। বাড়িতে ছিল কুস্তি-ডন-বৈঠকের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে নিয়মিত। বালক রবির বিদ্যার দায়িত্বে ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চলেছে নিয়মিত অধ্যয়ন। এই সময়েই তাঁর তিন মহাকবির সঙ্গে আলাপ হয়—মাইকেল, কালিদাস, সেক্সপীয়র।

৩০৩.১.১.৪ : বংশতালিকা

(amarboi.com থেকে পাওয়া)

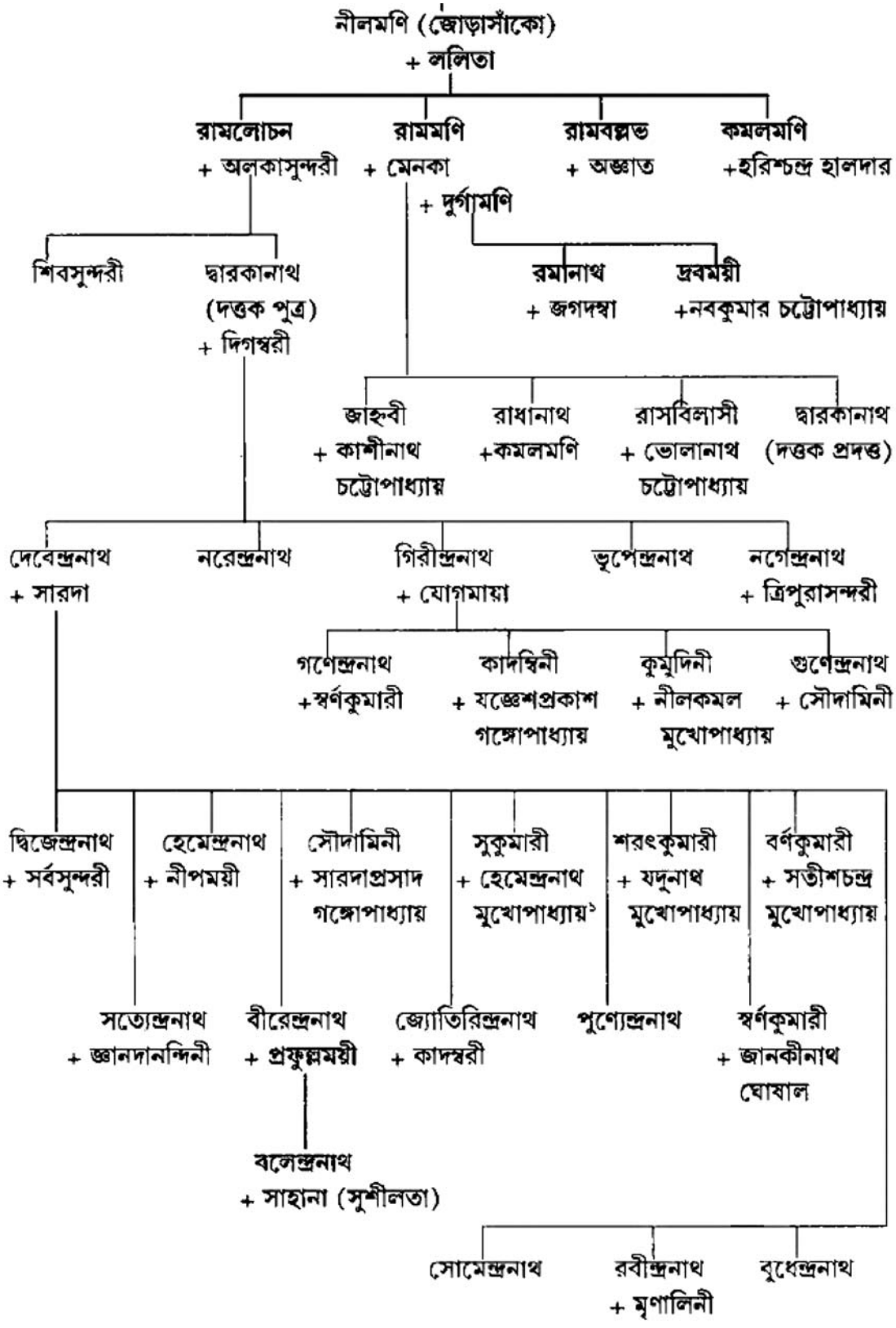

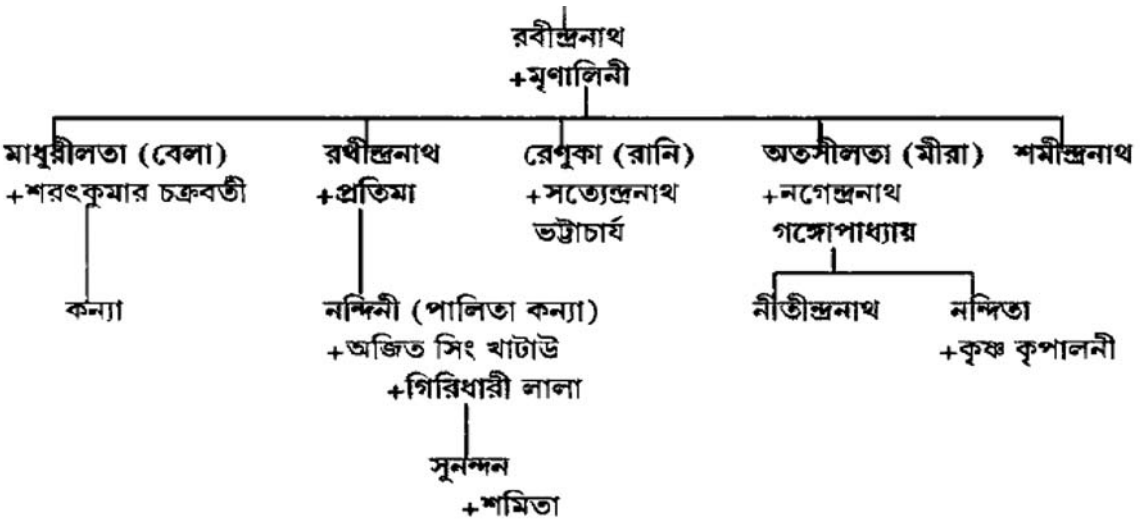

৩০৩.১.১.৫ : গৃহশিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে অন্যান্য পরিবারের সন্তানদের মতোই তাঁরও দিন কাটতো দাসদাসীদের মহলে। সারাদিন সেখানে থাকলেও রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে বা কখনও কখনও ঘুমিয়ে গেলে মায়ের কাছে যেতে পারতেন। খাবার খাওয়ানো, স্নান করিয়ে দেওয়া, গল্প শোনানো সমস্তটাই ছিল চাকরদের অধীনে। বাড়ির বড়োদের সঙ্গে ছিল বিস্তর দূরত্ব। রামায়ণ মহাভারতের চর্চা চাকরদের কাছে হলেও পড়াশুনার পাঠ শুরু হয় গুরুমশাইদের কাছেই। 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করলে জানা যায় 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-এই কবিতাকেই বলা হয়েছে বালক কবির প্রথম কবিতা। 'জীবনস্মৃতি'-তে বলেছেন'আমার জীবনের এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। ... এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।' 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' তো ছিল কবির কথায় শৈশবের মেঘদূত।'

বাড়িতে তিনটি বালক একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতেন। অনতিজ্যেষ্ঠ দাদা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ ও বালক রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনে পড়াশুনা করতেন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বীকার করেছেন'আমার দোষ হচ্ছে, শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর।' জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর থেকেই মাধব পণ্ডিতের কাছে রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনা শুরু হয়। পণ্ডিতমশাই তাঁর সমস্ত পাণ্ডিত্য প্রকটিত করার অবকাশ পেয়েছিলেন বালকদের উপর। সকাল আটটা থেকে রাত্রি আটটা-নটা পর্যন্ত চলতো বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান এই সব বইয়ের পড়া। সেই পড়াশুনার কাজটি ঠিকমতো চলছে কিনা তার তদারক করতেন মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছেলেবেলা'য় কবি বলেছেন, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই ঘর্ঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তাম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে...।' এইভাবে

একবছর পড়াশুনার চর্চার পর কবিকে ভর্তি করা হয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। সেখানে বছরখানেক পড়াশুনার পর তাঁকে ভর্তি করা হয় নর্ম্যাল স্কুলে এবং কিছুদিন পরে আবার স্কুল পরিবর্তন করে ভর্তি করা হয়। 'জীবনস্মৃতি'-তে কবি বলেছেন, 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলি ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম...।' অগ্রজ ও সত্যপ্রসাদের স্কুলে যাওয়া দেখে কান্নার জেরে স্কুলে যাওয়া শুরু হলেও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বেশিদিন ছিলেন না। অকালে সেখান থেকে সরে গিয়ে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। নর্মাল স্কুলের কথাপ্রসঙ্গে স্মৃতির ঝাপসা রেখায় কবি উল্লেখ করেছেন,'প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না।'

যাই হোক রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে বিদ্যালয়ের পাঠ যখন হয়ে উঠছে না; তখন বাড়িতে নানা বিদ্যার আয়োজনে কবির অধ্যয়নের একান্ত নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়। এই শৈশব থেকেই বালক কবি নিজের মতো করে সমস্তকিছু রচনা করতে শুরু করেন এইভাবেই। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর কাছে ছিল অবহেলার বিষয়, তুলনায় তিনি নিজের পছন্দমতো পড়াশুনা করতেন বেশি। স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করেই তিনি বাল্যকালে সমস্ত কিছু পড়ে ফেলেছেন। বলাই বাহুল্য স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করেন। তেরো বছর বয়স পর্যন্ত কবি যেমন স্কুল বদল করেছেন, তেমনি বদল হয়েছে গৃহশিক্ষকও। হেরম্ব তর্করত্নের কাছে পড়েছেন 'মুগ্ধবোধ', 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব'। এখানে একটু জানিয়ে রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে মাতৃভাষায় মতোই সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষাতেও দক্ষতা ছিল দেখবার মতো। তাছাড়া তিনি জানতেন আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিন্দি, মৈথিলী ও অসমীয়া। আমরা জানি কবির চার বছর বয়সে 'বর্ণ পরিচয়', 'শিশু শিক্ষা' শেষ হয়েছিল। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণীবৃত্তান্ত', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'প্যারি সরকারের ফার্সবুক' এছাড়াও জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের বই তিনি নিয়ম করে রুটিন মেনে পড়তেন।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন'তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়ীতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। ... ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পড়িয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।' রবিবার সকালে গান শিখতেন বিষ্ণু পণ্ডিতের কাছে। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের

কাছে অস্তিবিদ্যার চর্চা করেন। তার দিয়ে জোড়া দেওয়া একটি নরকঙ্কাল কিনে সেই বিদ্যাদান পদ্ধতি ছিল অভিনব। উপনয়নের পরে পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণকালে ষোলকলা পরিপূর্ণ হয়। পাঠ্যপুস্তক, বাইরের বই, তা সে ইংরেজি সংস্কৃত যাই হোক না কেন, সমস্ত মিলে দুই বাক্স বই সঙ্গে নিয়ে যান মহর্ষি। এইসময় 'ব্যাকরণ কৌমুদি' জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' 'Peter Parley's Tales' গোত্রের কিছু বই, 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি নানান গ্রন্থ বালক কবি পিতৃদেবের কাছে পড়েন। প্রত্যাবর্তনের পরেও পড়াশুনা থেমে থাকেনি, সেখানে যুক্ত হয় একত্রে বাঁধানো 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'আরব্য উপন্যাস', 'পারস্য উপন্যাস', বাংলা 'রবিনসন্ ক্রুশো', 'সুশীলার উপাখ্যান', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ। সমকালের সমস্ত বাংলা রচনা ও মধ্যযুগের সমস্ত গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছিলেন। সুতরাং এইভাবে শিক্ষার প্রকৃত পাঠ তিনি ঠাকুবাড়িতেই পেয়েছিলেন। বাল্যকালের শিক্ষার অভিজ্ঞতার কথা তিনি সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। 'বিশ্বভারতী'-তে (২০ ফাল্গুন, ১৩২৮) আছে 'আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি...।' প্রাণের সম্বন্ধহীন বিদ্যাচর্চার পদ্ধতিকে তিনি সবসময় ঘৃণা করেছেন। প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় বেড়ে ওঠার মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা বলে তিনি মনে করতেন।

৩০৩.১.১.৬ : উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, কবিদের কবি, এমনকি তিনি ছিলেন মহাকবি। সূর্যের মত কবি নিজের সৃষ্টিতেই নিজে প্রকাশিত। পৃথিবীতে এমন কোনো বিষয় নেই যা তিনি ধরতে পারেননি, মানবজীবনের এমন কোনো মুহূর্ত নেই যা তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পরেনি, এমন কোনো দর্শন নেই যা তাঁর লেখনীর মধ্যে ফুটে ওঠেনি! তিনি বিচিত্র বিস্ময়কর এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠেন। স্রষ্টা হিসেবে সমালোচক হিসেবে সার্থক পথদ্রষ্টা হিসেব এমনকি জমিদার ও সাধারণ মানুষ হিসেবে ইহজন্মের সমস্তরূপেই তিনি ছিলেন সার্থক রূপকার এবং একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শিক্ষার দিক থেকে তিনি এক বিরলতম প্রতিভাপ্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে গৃহশিক্ষকদের কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করে তিনি যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তা সম্পূর্ণ হয়েছিল বালক কবির দৃঢ়তায়। পড়াশুনা শুধু চারদেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা তিনি প্রমাণ করে দেখালেন। পিতৃদেবের সঙ্গে চলতে চলতে পথে প্রান্তে উন্মুক্ত পরিবেশে, মুক্ত মনের পরিসরে তিনি প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। এইদিক থেকেও তিনি ছিলেন আমাদের পেরণা ও পথপ্রদর্শক। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন'অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সমগ্র ভূমিকা।'

৩০৩.১.১.৭ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্রনাথ পঠিত গ্রন্থগুলির নাম লেখো। তাঁর বাল্যশিক্ষা পর্বটি কেমন ছিল সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

খ) ঠাকুরপরিবারে ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

গ) রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা ও অধ্যয়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৩০৩.১.১.৮ : সহায়ক গ্রন্থ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবি-কথা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র— গ্রন্থপঞ্জি

প্রশান্ত কুমার পাল — রবিজীবনী

পুলিনবিহারী সেন — রবীন্দ্র—গ্রন্থপঞ্জি

অসিত কুমার হালদার — রবিতীর্থে

অমিতাভ চৌধুরী — রবিকাহিনী

একক - ২
রবীন্দ্রনাথ ও বহির্জগৎ

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.২.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.২.২ : পেনেটির বাগান : প্রথমবার বাইরে যাত্রা

৩০৩.১.২.৩ : পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ

৩০৩.১.২.৪ : হিন্দু মেলা

৩০৩.১.২.৫ : উপসংহার

৩০৩.১.২.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.১.২.১ : ভূমিকা :

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মানুষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে আমাদের মতো সাধারণের বিস্ময়ের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যভূবনের যে পরিচয় আমরা এতদিনে পেলাম তা একভাবে; কিন্তু যা পেলাম না তার কথা আমাদের ভাবতে হবে এই ধরনের জীবনীচর্চার মধ্যে দিয়েই। জীবনের কিছু ঘটনা, কিছু দুর্ঘটনা কিছু সৃষ্টি এই সমস্ত দিক দিয়েই কবিকে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে তার কথা জানতেই আমাদের এই প্রয়াস। সারাজীবন তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। জমিদারী পরিদর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পত্রিকা সম্পাদনা, স্বদেশী আন্দোলনে দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি নানা কাজে সারাজীবন তিনি ভীষণ কর্মব্যস্ত ছিলেন।এর মধ্যে একমাত্র সাহিত্যসাধনা ছাড়া তিনি জীবনে আর কোনও কাজে সমগ্রভাবে আশ্রয় করে থাকেননি। তাঁর শরীর মন ভাবনা দর্শন সমস্ত দিয়েই সারাজীবন শুধু সৃষ্টি করে গেছেন। তাই তিনি তাঁর দুর্লভ ভাবনা মধ্যেই জীবিত আছেন। নিত্যনতুন সৃষ্টির মধ্যেই ছিল তাঁর প্রকৃত আনন্দ।

জন্মের পর তিনি চাকরদের শাসনের অধীনে কাটাতে হয়ে দীর্ঘকাল। সে ছিল এক সাধনার পর্ব; সিদ্ধিলাভ হয়েছিল তারও অনেক পরে। মহর্ষি বাড়ির বাইরেই বেশিরভাগ থাকতেন। তাই ঘরের মধ্যে বন্দী

থাকতে হয়েছে বালক রবীন্দ্রনাথকে। বন্দী থেকেও কীভাবে জীবনের গুরত্বপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করা সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখতে শিখিয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'-গ্রন্থে কবি বলেছেন,'আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।' আহারে বিহারে আয়োজনে রসদ ছিল যৎসামান্য; তাই বালক কবির কাছে যেটুকু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে তা সম্পুর্ণ গ্রহণ করবার পরিপূর্ণ তাগিদ লক্ষ করা গেছে। যে মানুষটি বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বমানবের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং সমগ্র মানবজগতের দুঃখ, কষ্ট, বেদনাবোধকে ও তার থেকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্মাণ করেছিলেন তিনি বা তাঁর দৃষ্টি সমগ্র মানবজগতের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি যখন চার দেওয়ালের বাইরে গিয়ে প্রকৃতিকে দেখছেন তখন তাঁর গণ্ডির কথা আর থাকছে না।

৩০৩.১.২.২ : পেনেটির বাগান : প্রথমবার বাইরে যাত্রা

'কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তা বাঁধন কেন।
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের বাঁধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর...।'
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাতসঙ্গীত।

১৮৭২ সালের ১৪ মে রবীন্দ্রনাথ পেনেটি গিয়েছিলেন। তখন তিনি ১১ বছরের বালক। ঠাকুরবাড়ির সমস্ত সদস্যদের দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ১-ম ভাগ গিয়েছিল কোন্নগর আর দ্বিতীয়ভাগ পেনেটিতে উপস্থিত হয়। এই প্রথমবার বালকের সুযোগ হল শহর ছেড়ে শহরতলিতে যাবার। 'জীবনস্মৃতি' পাঠে জানা যায় 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' গঠিত রবীন্দ্র—মনের বিকাশ সাধনে কয়েকটি স্থানিক পরিবেশ ভীষণভাবে সহায়ক হয়েছিল পেনেটি এমন একটি কিশোরমনে রেখাপাত করার মতো একটি পবিত্রতম স্থান। প্রথমবারের জন্যে সদ্য বহির্গমনে আগত কিশোরমন পেনেটির গঙ্গাতীরে ছাতুবাবুর বাগানবাড়িতে এসে উপলব্ধি করলেন বাইরের জগতের সেই প্রকৃত রহস্যকে। আবদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে যে মন প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত রাজ্যে মুক্তির জন্যে ব্যাকুল ছিল সে মন সর্বপ্রথম সেই মুক্তির স্বাদ পেল এই পেনেটির বাগানে। বাইরের প্রকৃতি কেমন তার রূপ রস সংগ্রহ করলেন কবি।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাগানবাড়িতে গেলেন তখন সারাদিন কর্মব্যস্ত জীবন কাটাতে হয় বালককে। এই কর্মব্যস্ত যাপনের থেকে বাইরে গিয়ে কিছু পৃথক হলে সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। 'জীবনস্মৃতি'-তে

(বাহিরে যাত্রা) অনেক তথ্য আছে তার পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছে নেই। শুধু একটি কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন,'গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত।' এই পর্বে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আসলে 'অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে এইজন্য যাহার সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।' বাংলাদেশের পাড়াগ্রামকে এক কথায় পল্লীপ্রকৃতিকে দেখার সৌভাগ্য হল প্রথম। সেই অভিজ্ঞতা এখানে মূল্যবান বিষয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত।' যে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্নপ্রান্তে জমিদারীর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর সময়। পল্লীকে খুব কাছ থেকে দেখবার পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি সেই সময় পেয়েছিলেন।

পরবর্তী বৃহত্তর ভারত দর্শনের রূপ ধরা ছিল এই ক্ষুদ্র পরিসরে। 'কালান্তর'-এর 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখেননি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। ...সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ, বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। ...সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।'

এই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে এই পেনেটির বাগানবাড়িতে যাওয়া শুধুই বেড়াতে যাওয়া নয়; ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মহৎ আদর্শের কিছু গোপনকথা। শিশুপ্রকৃতির প্রাণের গোপন স্তরে লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের বিশাল উদ্যমের সূত্রগুলি। প্রকৃতির সাহচর্যে সেই শিশুপ্রকৃতি তাই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে তাই মনপ্রাণ দিয়ে একাত্মভাবে সমস্তকিছু অনুভব করতেন। তাই তিনি পেনেটির বাগানের কথা সারাজীবন মনে রেখেছেন। 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে আছে, 'তারপর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। ...ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্পলোকের ভাগ্যেই তা ঘটে।' নদীর দুইধারে বর্ণনা গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাকে দেখবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা সেখানে বিস্তৃত আকারে উল্লিখিত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার কথা স্মৃতিকথা (জীবনস্মৃতি-১৯১১), প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্র

ও নানাস্থানে ঘুরেফিরেই এসেছে। এমনকি জীবনের শেষপ্রান্তে গিয়েও তিনি স্মরণে সেকথা রেখেছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া সম্ভব। সুতরাং পেনেটি শুধু একটি স্থানে ভ্রমণস্থল নয়; শিশুমনের বা বালকমনের একটি অভিজ্ঞানও।

৩০৩.১.২.৩ : পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় খুব অল্প সময়ের জন্য থাকতেন। প্রবাসেই বেশি সময় কাটাতেন তিনি। কলকাতায় থাকাকালীন বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম থাকতো, সকলেই দেখতে না পেলেও বেশ টের পেতেন মহর্ষি সেখানেই আছেন। বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই খবর খুব একটা পৌঁছাতো না। বালক থাকতেন চাকরদের অধীনেই। মাঘোৎসবের পরে ২৫ মাঘ, ১২৭৯ সাল, (৬ ফেব্রু ১৮৭৩) সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপনয়ন হয়। এর পরই কবি ফিরিঙ্গি স্কুলে যাবার বিষয়ে চিন্তা করছেন। এমন সময় পিতা জানতে চান হিমালয় যাত্রায় সঙ্গী হবার ইচ্ছে আছে কিনা। পুত্র ইচ্ছাপ্রকাশ করলেই সঙ্গী করে নেন! এই যাত্রায় বালক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি দিকে লাভ হয়েছিল যেমন, এই প্রথমবার পিতৃদেবের কিছুকাল অতিযাপনের সাহচর্যলাভ, পিতৃদেবের অত্যন্তপ্রিয় বীরভূমের শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটানো ও বিপুল ও বিস্তর জ্ঞানলাভের সুযোগ, আর পিতৃদেবের সঙ্গে কিছুকাল শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যচিন্তা ও কল্পনার বিস্তার এই পর্বে পিতৃদেবের থেকে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে পেয়ে সমৃদ্ধ হলেন। তাই এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে দীক্ষাগ্রহণের পর্ব হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। গুরুকে পেয়ে বালককে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। পিতৃদেবই ছিলেন বালকের জীবনের প্রথম ও প্রকৃত গুরু। কখনো ডালহৌসির পাহাড়ে, কখনো অমৃতসরে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির পাঠ, নানা গ্রন্থের পাঠ, ধর্মের পাঠ, জীবনের পাঠ গ্রহণ করে বালক ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই পর্ব তাই রবীন্দ্র জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ।

ছেলেবেলায় হিমালয় যাত্রার পূর্বে কিছুদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ আসেন। পিতা পুত্র বোলপুর পৌঁছলেন ১৮ফাল্গুন ১২৭৯, ১৮৭২ সালে। রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে এই জমিটি মহর্ষি বন্দোবস্ত করেন। তখন ভুবনডাঙায় কয়েকজন দরিদ্র পরিবারের বাস। ১৮৬৩ সালে ২০ বিঘা জমির উপর মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপন করেন। ১০ বছর পরে পুত্রকে নিয়ে আসেন এখানে। কিছুদিনের জন্যে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। শান্তিনিকেতনে মহর্ষির পরিচারক ছিল হরিশ মালী। এই হরিশ মালীর সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ খুব মজা করে ঘুরে বেড়াতেন। মহর্ষিও তাতে বাধাদান করেননি কোনও সময়। বালকের এই প্রথম ট্রেনে চড়া নতুন দেশে আসা, শান্তিনিকেতনে প্রথম আসা। তখন তিনিও জানতেন না এই স্থানটি একদিন বালক কবির কাছে সাধনপীঠ হয়ে উঠবে। এই স্থানে একটি নারকেলগাছের নীচে বসে তিনি লিখে ফেললেন ‘পৃথ্বীরাজ পরাজয়’ নামে নাটক। ‘শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা উল্কাবৃষ্টির মতো, বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনী।’ আমরা জানি ১৮৬৮ সালে সর্বপ্রথম কবিতা রচনার প্রয়াস করেন। তবে প্রথম কবিতা ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় ১২৮৯ সালে ‘অভিলাষ’ প্রকাশিত হয় কবির নাম উহ্য (উল্লেখ ছিল ১২ বছর বয়স্ক বালকের রচনা)।

বোলপুরে কিছুদিন কাটিয়ে মহর্ষি পুত্রকে নিয়ে ডালহৌসি যাত্রা করেন। ডালহৌসি পাহাড়ে বকরোটা গিরিশৃঙ্গে রাত্রির উন্মুক্ত প্রান্তরে জ্যোতিষ্কলোকের সন্ধান দিলেন মহর্ষি। এখান থেকেই শিশুমন আকাশে প্রকাশিত হওয়া ও আলোকিত হবার বাসনা জন্মায় বেশি করে। এই তো মানবাত্মার চিরন্তন বাণী, যা কবি গ্রহণ করলেন পিতৃদেবের কাছে। বোলপুরে যাওয়ার পূর্বে তাঁদের সঙ্গে বাক্স বাক্স অনেক বই গিয়েছিল। পিতা ভোর হলে পুত্রকে পাশে ডেকে নেন। ছেলের সঙ্গে আরেক বার উপাসনা করেন। উপনিষদের মন্ত্র পড়ে শোনান। অর্থ সব বোঝে না বালক; কিন্তু ধ্বনিটি মন্দ লাগে না। ভগবতগীতা থেকে শ্লোক বেছে বেছে দাগ দিয়ে পুত্রকে নকল করতে বলেন, আবার কখনও বা অনুবাদ করতে বলেন, উপক্রমণিকা পড়ান, সেই সঙ্গে একটু একটু করে ইংরেজি। এই সময়ে বালক কবি শেখেন কাকে বলে আধ্যাত্মিক তন্ময়তা ! এই পাহাড়ের বুকে চলতে চলতে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির সুনিবিড় ছায়া ও বনরাজি বালক মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। বাসার কাছে বিস্তীর্ণ বেণুবনে একটি লৌহফলক বিশিষ্ট লাঠি নিয়ে আপন মনে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। মহর্ষি কখনও সে পথের বাধা হয়ে দাঁড়াননি; কিন্তু সর্বত্র পিতৃদেবের একটি তীক্ষ্ণ নজর বালকের পেছনে পেছনে ঘুরে মরতো। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে তিনি অবলীলাক্রমে ঘুরে বড়াতেন। ভ্রমণে বালকের ছিল অবাধগতি। ভ্রমণ শেষ হলে পুত্রকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ইংরেজি পড়াতেন। দুপুরে স্নান ও আহারাদির পর পুত্রকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। পড়তে বসলেই রাজ্যের ঘুম চোখে এসে পড়তো। মহর্ষি বুঝতে পেরেই ছুটি দিয়ে দিতেন। আর ছুটি পেলেই ঘুম যেত হারিয়ে।

পরে সন্ধ্যায় পিতা বসতেন বালককে নিয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি লেখার একটি গুরুত্ব পুত্রকে বুঝিয়ে বলতেন। এই ছিল পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পিতাপুত্রের খেলা। সেই খেলা সাঙ্গ হলে পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। এবার বাড়িতে আর পূর্বের মতো চাকরদের শাসনের সীমা গেল মুক্ত হয়ে। বাড়ির ভিতরে যেখানে খুশি যেতে পারতেন। মায়ের ঘরের সভায় একটি আসন পেলেন। গল্প বলতেন, রামায়ণ সুর করে পড়ে শোনাতেন। সুতরাং হিমালয় ভ্রমণের পূর্ব রবি আর পরের রবির মধ্যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই ভ্রমণের গুরুত্বটি ঠিক কোথায় ! ১৮৭২ সালে হিমালয়যাত্রা থেকে শুরু করে ১৮৮০ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের কাল। তখন তিনি সমস্ত বাংলা সাহিত্য পড়ে নিচ্ছেন, সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রাণভরে গ্রহণ করেছেন, সমস্ত কিছু স্পর্শ করে দেখছেন। বালকমনের গঠনপর্ব তাই এই সময়টি।

৩০৩.১.২.৪ : হিন্দু মেলা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন সাধারণের ধারণা স্বাদেশিকতা মানেই হল প্রথাগত হিন্দুয়ানী। নব্যশিক্ষিত বাঙালি মানুষদের এই স্থান থেকে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁরা মনে করতেন ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ, মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতির দেশ নয়। তাদের ইংরেজদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে বিচার করার প্রবণতা জন্মায়। এই 'সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা'র প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন। এই 'সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই নবগোপাল মিত্র হিন্দু

মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। নামকরণেই তাঁর স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। নবগোপাল মিত্রের লক্ষ্য ছিল স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষাচর্চার পুনরুদ্ধার। এর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের বা ইংরেজ আধিপত্য কমানো সম্ভব হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। সর্বোপরি ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন-বৃত্তি জাগরণের উদ্দশ্যেই এই মেলার সূচনা।

এই মেলার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬৭ সাল, বাংলা ১২৭৩ চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে। প্রথম তিন বছর এই মেলা চৈত্রসংক্রান্তিতেই হয়; তাই শুরুতে এই মেলা চৈত্রমেলা' নামেই পরিচিত ছিল। পরে এই মেলা 'হিন্দু মেলা'র রূপ পায়। ১৮৬৮ সালে ২-য় অধিবেশনে এই মেলায় ভারতের প্রথম সিবিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' জাতীয় সংগীতটি রচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন (আমার বাল্যকথা, ১৯৬০, পৃ ৫০), "আমি বোম্বায়ে কার্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়োদাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই আমার ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা।" গণেন্দ্রনাথ প্রচার করতেন এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য বছরের শেষে সকল হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা, সংঘবদ্ধ করা এবং নানান বিষয়ে মত ও মতাদর্শের আদানপ্রদান করা। তাছাড়া বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরতা ছিল প্রধান মেরুদণ্ড। যা ভারতবর্ষের মতো দেশের খুব অভাব ছিল।

বালক রবীন্দ্রনাথের মননে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির সুর ধ্বনিত হবার পেছনের ইতিহাসে গ্রথিত আছে এই হিন্দু মেলার কথা। ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামযুক্ত সর্বপ্রথম যে কবিতা তার নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। কবিতাটি ১২৮১ সালের ৩০ মাঘ (১৮৭৫ খ্রি) পঠিত হয়। বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন সেটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতা স্বল্প অনুসরণ মাত্র। কবির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ না থাকলেও আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই মেলার ওতপ্রোত যোগ স্থাপিত হয় ক্রমে। এই মেলাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের বালক মন উজ্জীবিত হয়ে উঠল স্বদেশ-চেতনার প্রতি। এর পরেও ১৮৭৬ সালে জ্যোতিদাদার সঙ্গে কবি শিলাইদহে প্রথমবার যান।

৩০৩.১.২.৫ : উপসংহার

রবীন্দ্রজীবনে এই দুটি ঘটনা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি পেনেটির বাগানে যাত্রা ও দ্বিতীয়টি হিন্দু মেলার সঙ্গে কবির যোগসূত্র। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাবুক ও ভাবপ্রবণ। মহর্ষি বুঝেছিলেন এই সন্তান আর পাঁচজন বালকের মতো নয়। তরুণ বয়সেই কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। স্কুলবিমুখ একটি বালক বাড়িতে সকলের ভীষণ প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাই উপনয়নের পরেই খুব স্বল্প বয়সেই দুরূহ উপনিষদ এবং

গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন মহর্ষিদেব। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে নিজের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে সঙ্গী করে নিলেন। শান্তিনিকেতন হয়ে হিমালয়ের পাহাড়ের কোলে কিছুকাল বসবাস করে ও পিতৃদেবের সাহচর্য লাভ করে তিনি পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুমেলার সঙ্গে যোগ অবশ্য শুধু কবিতা পাঠ নয়, বাড়ির অন্দরমহলে স্বাদেশিকতার জোয়ারকে অনুভব করতে এই মেলার সমকক্ষ আর কিছু ছিল না। অগ্রজদের সৃষ্টিকল্পের প্রকৃতরূপের পরিণত একটি আগ্রহ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই পর্বটি জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৩০৩.১.২.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ বালক কবির কাছে কোন কোন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার পরিচয় দাও।

খ) শান্তিনিকেতনে কিছুকাল বাসের অভিজ্ঞতা বালকের কাছে কেমন ছিল তার বর্ণনা দাও।

গ) হিন্দু মেলার সঙ্গে ঠাকুরপরিবারে যোগ কতখানি তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করো।

৩০৩.১.২.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য — রবীন্দ্র চরিত

সুধীরচন্দ্র কর — রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — রবীন্দ্রকথা

একক - ৩

রবীন্দ্রনাথ ও 'ভারতী'-পর্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৩.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.৩.২ : ভারতী পত্রিকা

৩০৩.১.৩.৩ : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

৩০৩.১.৩.৪ : উপসংহার

৩০৩.১.৩.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.১.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.১.৩.১ : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ করেননি। কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, গান, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তিনি বিশেষত্বের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত সিদ্ধি শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে একথা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়াবহ। কথাসাহিত্য, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণকথা, নাটক-নাটিকা প্রভৃতি সৃজনশীল ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর অভূতপূর্ব মন পরিপূর্ণ ছিল একদিকে ভারতীয় দর্শন; যা উপনিষদের ভাবনায় সিক্ত, আর অন্যদিকে ছিল বিশ্বমানবতার সংকটপূর্ণ প্রত্যয় দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা ও সৃষ্টিকর্ম এবং ব্যক্তিত্বকে অনুধাবনের চেষ্টা দীর্ঘদিন থেকেই শুরু হয়েছে। তাঁর উনিশ শতকের রূপের সঙ্গে বিশ শতকের রূপের কিছুটা পার্থক্য করা যায়। তাই উনিশ শতকের রবীন্দ্রচর্চা আমাদের আলোচ্য বিষয় তাই অনেক কথা বলবার থাকলেও শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। যদিও এই বিষয়টি শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়। তবুও একটি মাপকাঠি না থাকলে বৃহৎ মহীরূহস্বরূপ কবিকে মেপে দেখার চেষ্টা এক্ষেত্রে বৃথা।

৩০৩.১.৩.২ : ভারতী পত্রিকা

হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর বালক আর আগের বালক থাকলো না; জ্যেষ্ঠদের বা অগ্রজদের নজর পড়লো বিস্ময়কর বালকের প্রতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আসরে সরাসরি স্থান পাকা হল। তিনি অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠাকুরবাড়ি থেকে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কানে এই কথা পৌঁছালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকেই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে একখানি ভালো পত্রিকা সম্পাদনার কথা বলেন। তিনি এই নবপত্রিকার নাম দেন 'সুপ্রভাত'। কিন্তু পরে সকলের সেই নাম পছন্দ না হওয়ায় পরিবর্তে রাখা হয় 'ভারতী'। শুরুতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকলেও প্রকৃত কর্ম-কর্তা ছিলেন কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রধান সহায়ক রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকেই সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।' সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে, পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ, কর্মকর্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সহায়ক রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী। তাই 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাওয়ার তিন মাস পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে তা ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা হয়ে ওঠে।

১২৮৪ বঙ্গাব্দে ইং ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের উপর ভার ছিল। ১৩০৫ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকায় নানান স্বদেশিকতামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। স্বদেশকে ভালোবাসার যে ঐকান্তিক আগ্রহ তা বাংলাদেশে ঠাকুরপরিবার থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন(ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪), 'স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।' এখানে যাঁদের লেখা স্বদেশচেতনাকে উজ্জীবিত করেছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, রাধাকান্ত বসু, রমেশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী অনুরূপা দেবী প্রমুখজন।

উনিশশতকে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী। সম্পাদকের একটি তালিকা এই সূত্রে প্রদান করা যেতে পারে

সময় পর্ব (বঙ্গাব্দ)	**সম্পাদক**
১। ১২৮৪, শ্রাবণ ১২৯০	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। ১২৯১১৩০১	স্বর্ণকুমারী দেবী
৩। ১৩০২১৩০৪	হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী

৪। ১৩০৫ বৈশাখ চৈত্র ১৩০৫	রবীন্দ্রনাথ
৫। ১৩০৬১৩১৪	সরলা দেবী
৬। ১৩১৫১৩২১	স্বর্ণকুমারী দেবী
৭। ১৩২২১৩৩০	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়,
৮। ১৩৩১১৩৩৩ আশ্বিন	সরলা দেবী

বাংলা যে-কোনো সাহিত্যপত্রে 'বহুবিষয়কতা' একান্ত কাম্য। সেই দিক থেকে 'ভারতী'(১৮৭৭) উনিশ শতকের সাহিত্যপত্রের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ভারতী' অনেকদিন পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি-পরিচালিত হওয়ায় তার নিজস্ব একটা চরিত্র গড়ে ওঠে। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল, 'ভারতীর উদ্দেশ্য যে কী, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।'

'তত্ত্ববোধিনী'-র পর ঠাকুরবাড়ির আর একটি দীর্ঘকাল জীবত থাকা পত্রিকা হল 'ভারতী' ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত। ৪৯ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই পত্রিকার সাতজন সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম সম্পাদক হিসেবে ২২-তম বর্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করে এক বছর কর্মকর্তা ছিলেন 'এক বছর ভারতী সম্পাদন করিলাম...।' এই সময় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে প্রবন্ধ-নিবন্ধই বেশি প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধ-৬৩ টি, গল্প-৯ টি, কবিতা ও নাট্যকাব্য- ২৫ টি, সাময়িকপত্র- চিত্রকলা সমালোচনা- ৪৮ টি, ৩ টি স্বরলিপি, ৫ টি গান প্রভৃতি। এই ভারতীর সম্পাদক পদটি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী দুই বছর আর কোনো পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেননি। ১৯০১ সালে পুনরায় তিনি 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'-র ভার গ্রহণ করেন।

৩০৩.১.৩.৩ : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এগারো কি বারো থেকে আঠারো উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যত সৃষ্টি করেছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'বাল্মীকি প্রতিভা'-ই শ্রেষ্ঠ এ কথা জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও মনে করতেন। সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' (১২৭৯), 'কবি-কাহিনী' (১২৮৫), 'বনফুল' (১২৮৬), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭), 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮), 'কালমৃগয়া' (১২৮৯), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১), 'সন্ধ্যা সংগীত' (১২৮৮), 'প্রভাত সংগীত' (১২৯০), শৈশব সংগীত'(১২৯১)। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' বাদ দিয়ে বাকি রচনা তদানীন্তন বাংলা-কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে নগণ্য নয়। এই সময়ে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী বালক কবির চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। বিশেষ করে তাদের ভাষা ও ছন্দ কবিহৃদয়কে সিক্ত করেছিল বেশি। সুতরাং বৈষ্ণব পদকর্তাদের আদলে বালক কবির কিছু পদ রচনার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এই স্থান থেকেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে লিখতে শুরু করেন তখন বাংলাসাহিত্য কৃশকায় ছিল। তিনি যখন বৈষ্ণব কবিতা পড়ছেন তখন বটতলা ছাড়া আর কোথাও তা পাওয়া যেত না। আর এই বটতলার ছাপাতে ভুল থাকতো বেশি। তখন রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' মনযোগসহকারে পড়তেন। পদাবলীর মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা কবির কাছে দুর্বোধ্য থাকলেও একান্ত কৌতূহলবশত তিনি তা পাঠ করে যেতেন। কিশোর বয়সেই তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি বলেছেন'গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে—রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।' সূচনায় বলেছেন, পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষা কবির কাছে প্রধান কৌতূহলের কারণ ছিল। নতুন নতুন শব্দবন্ধ কবিকে সর্বদা নতুন জগতে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিল। তাই পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সঠীক সংস্করণ প্রকাশ করতে যান তখন রবীন্দ্রনাথের এই খাতাটি তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেছিলেন। সেই খাতা যদিও আর কবি ফিরে পাননি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ও বাংলাভাষার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে যখন বাংলার শিক্ষিত সমাজ প্রায় অজ্ঞাত ছিল তখন তিনি টীকার উপর নির্ভর না করে মূল পাঠ বোঝার চেষ্টা করতেন। কোনো দুরূহ শব্দ পেলে খাতায় নোট করে রাখতেন। পাঠ্য পদের পাশাপাশি লিখে রাখতেন 'মূল পাঠ দ্রষ্টব্য' প্রভৃতি। ইতিমধ্যে বালক-কবি চ্যাটার্টনকে নকল করবার ইচ্ছায় দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার বাসনায় এই ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী রচনা করেন। 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে/ মৃদুল মধুর বংশি বাজে।' লিখেই তিনি বোধ করলেন, 'বেশ হয়েছে।' ভানুসিংহ নামের আড়ালে থাকার কারণ আর ছদ্মনামের অন্তরালে থাকার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে জীবনস্মৃতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে পূর্বেই শুনেছিলেন এই চ্যাটার্টনের গল্প। এই চ্যাটার্টন আড়ালে থেকে কবিতা রচনা করতেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছিলেন নামের আড়ালে থেকে কবিতা রচনা করবেন ও সমতুল ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও খাঁটি নকল করবেন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এখানে 'সেই বৈষ্ণব চিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।' সেই কারণে এই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বহুকাল কবি সংকোচের সঙ্গে বহন করে চলেছেন। সুতরাং আমাদের যে দিকগুলি আকৃষ্ট করে তা হল বালক কবির মৌলিক প্রচেষ্টা, কবির সৃষ্টিপ্রেরণার আনন্দ, প্রথাগত কৃত্তিম ভাষায় অকৃত্তিম পদরচনা, পদগুলির দার্শনিক ভিত্তি, সুরধ্বনি ও পদলালিত্য প্রভৃতি। এই সকল কারণে উক্ত গ্রন্থটি পাঠকের ও স্রষ্টার মুগ্ধতার প্রকৃত কারণ বলে মনে করা যায়।

৩০৩.১.৩.৪ : উপসংহার

'ভারতী' পত্রিকা ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী' সমগ্র বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করে আছে। ভারতীকে কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা আজও আমাদের কাছে একটি আকর্ষণীয় বিষয়। ছেলেবেলা থেকেই কবির যে যে অদম্য উৎসাহ ছিল তার বহিঃপ্রকাশ এই পত্রিকা। তিনি শৈশবে যে পদাবলীর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে যে ছন্দমুক্তি ও ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিচিত্র চিত্রসৃষ্টির প্রেরণা এবং নিবিড় ভাবোপলব্ধির জগৎ খুঁজে পেয়েছিলেন তাকেই নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে রূপ দিয়েছিলেন'ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী'-তে। বিষয় ও আঙ্গিকের অনুকরণ করলেও বৈষ্ণব কবিদের ভাবের অকৃত্তিমতা তিনি তাই সেই অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সর্বোপরি ভারতী পত্রিকা ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী' রবীন্দ্রজীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

৩০৩.১.৩.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের বিবরণ দাও।

খ) ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

গ) রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরে পদাবলী' রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩০৩.১.৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

যোগেশচন্দ্র বাগল — জাতীয়তার নবমন্ত্র

অর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় — হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত

সুকুমার সেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হরপ্রসাদ মিত্র — রবীন্দ্র—সাহিত্য-পাঠ (১ম)

অমিতাভ চৌধুরী — রবিকাহিনী

একক - ৪

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৪.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.৪.২ : বিলাতযাত্রা

৩০৩.১.৪.৩ : উপসংহার

৩০৩.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৪.১ ভূমিকা :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ--ভূমিকা'-য় বলেছিলেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্রা তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বপ্রাণের সাড়া অনুভব করার উপযুক্ত একজন মহানুভব মানুষ, দার্শনিক। এই রকম অনেক বিশেষণে ভূষিত করা যায়; কিন্তু বিশ্বজগতের মানুষের কাছে তিনি একজন সুযোগ্য ভ্রমণপিপাসু ও যোগ্য দ্রষ্টাও। রবীন্দ্রনাথ অদৃশ্য কোনো এক যাদুবলে সমগ্র বিশ্বের সুধীসমাজে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, চীন প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন ও সেখানের সুধীসমাজ তা গ্রহণ করেছেন। ভারত তথা বিশ্বের আর কোনো কবির ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। কবির জীবদ্দশায় এই বিশ্বের সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে যেভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন তা অভিনব একটি বিষয়। তিনি শুধু এশিয়া মহাদেশে নয়, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও সমানভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি তো শুধু ভারতের কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর কবি, মানুষের কবি। বিভিন্ন সময় কবির ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অমিয় চক্রবর্তী, নন্দলাল বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, রাণী চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখজন। সকলেই কিছু কিছু কথা প্রকাশ করেছেন নানান স্থানে।

৩০৩.১.৪.২ : বিলাতযাত্রা

বালক কবির বয়স যখন সতেরো তখন স্থির হয় তাঁকে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসতে হবে। স্কুলের ছাত্র হিসেবে যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ, প্রথাগত শিক্ষার জালে যখন এই বালককে আর জড়ানো গেল না; বাড়ির অগ্রজদের ক্রমশ মনে হতে থাকে এই বালকের দ্বারা আর কিছুই হবে না! 'জীবনস্মৃতি'-তে আছে, 'বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনোকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।' কিন্তু জ্যোতিদাদা তাকে এই সময়ে আত্ম-উদ্ঘাটনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কবির নিজের মধ্যেও যখন এই ব্যর্থতার বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে তখন জ্যোতিদাদা বালককে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ১৭ বছর বয়সে কবি তাঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি যখন প্রথম ও দ্বিতীয়বার বিলাতে যান তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান আহরণ। এই জ্ঞান তিনি সমগ্র বিশ্বের পণ্ডিতজনদের কাছে প্রকাশ করতে কার্পণ্যবোধ করেননি। সমগ্র বিশ্বে তা তিনি মুক্ত হস্তে বিতরণ করেছেন।

প্রথমবার দেশের বাইরে যাবেন, তাই এবার প্রস্তুতি ছিল একটু অভিনব রকমের। বিলাত যাত্রার পূর্বে মেজদাদার কাছে আমেদাবাদের শাহিবাগে জজের বাসায় কিছুকাল বাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, মেজদা আদালতে চলে গেলে তপ্ত দুপুরে একা সময় কাটানোর স্মৃতির কথা বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে'মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত।' একা সেই বৃহৎ প্রাসাদে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আর নানারকমের অভিজ্ঞতার দ্বারা ঝুলি পূর্ণ হতে থাকলো। ইংরেজিতে একটু কাঁচা ছিলেন বলে সারাদিন চর্চা করতেন।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে আগ্রহী ছিলেন। এগারো বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাত্রা করেন। ১৮৭৫ সাল, ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিলাইদহে যান পিতার সঙ্গে ও পরে সেই বছর ফাল্গুন মাসে জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহে যান। ভ্রমণে যে তিনি নির্মল আনন্দ পেতেন এবং জ্যোতিদাদার সঙ্গে ভ্রমণের কথা প্রসঙ্গে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বলেছেন,"জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি' হচ্ছে। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে-বাতাসে-চ'রে- বেড়ানো মন সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।" পেনেটির বাগানে গিয়ে যে মুক্ত প্রকৃতিকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবার তা পরিপূর্ণ হল।

আমেদাবাদ ভ্রমণ ও পরে বিলাতে যাওয়া এই পর্বটি রবীন্দ্রজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিভিন্ন কারণে এর গুরুত্ব, প্রশান্ত কুমার পাল 'রবিজীবনী'-র ২-য় খণ্ডে(পৃ ৪) বলেছেন—"আমেদাবাদে অবস্থিত রবীন্দ্রজীবনের কৈশোর-জীবনের একটি বড়ো ঘটনা। 'বাহিরে যাত্রা' 'হিমালয়যাত্রা' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রজীবনের দিগন্ত ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল। কিন্তু এগুলি ছিল মোটামুটি নির্জনবাস, জনতা যেটুকু ছিল সেটি আত্মীয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা সেখানে লাজুক মুখচোরা বালকের অস্বস্তির কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু কর্মব্যস্ত মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদে এসে সেই আড়ালটুকু ঘুচে গেল, অপরিচিত জনসমাজের সঙ্গে অনভ্যস্ত ভাষায় বাক্যালাপ তাঁর পক্ষে খুব সহজ না হলেও মানিয়ে না নিয়ে কোনো উপায়ও ছিল না।" নতুন কর্মযজ্ঞে যাত্রার পূর্বে প্রস্তুতি পর্বটি বালক রবীন্দ্রনাথকে পরিপক্কতার পথকে সুগম করে তুলেছিল। বাড়িতে দিদি ও দাদারা চাইছিলেন এইভাবে কর্মহীন না থেকে কিছু একটা করা প্রয়োজন এবং সেইসূত্রে সমকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি অনুসারে বিদেশ থেকে ব্যারিস্টর হয়ে দেশে ফিরে আসবে। সেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করে ব্যারিস্টর হয়ে কলকাতায় ফিরবেন এই আশা ও ইচ্ছে সকলের ছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে খালি হাতেই ফিরতে হল কবিকে।

আমেদাবাদে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি দিকে প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হল যেমন শাহীবাগে জজের বাসার নীচে সবরমতী নদী বয়ে চলেছে। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত ও খোলা ছাদ বালককবিকে কিছুকাল শান্তি দিয়েছিল। মেজদাদা আদালতে চলে গেলে ঘরের দেওয়ালে থরে থরে সাজানো বইগুলো তিনি নিজের মতো করে পড়ে ফেলার সুযোগ পেলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'অনেক-ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ', এছাড়া লাইব্রেরিতে ছিল ডাক্তার হেবর্লিন-এর দ্বারা সংকলিত সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ। এই ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটি ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ অনভিজ্ঞ থাকলেও বাক্যের ধ্বনি ও ছন্দের গতি বুঝে পাঠ করে যেতেন। এই ধরনের অভ্যাস বালককে গ্রন্থমুখি করে তুলেছিল বেশি। আমেদাবাদে বসবাসের পশ্চাতে প্রবাসের যাত্রার পূর্বে 'বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে' দেওয়া ছিল প্রধান কারণ। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে কবি বলছেন, 'শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।'

এই সময়ে তিনি একাকিত্বকে অনুভব করে ও তার উপর আশ্রয় করে 'নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি' রচনা করেন। আমেদাবাদের আবহাওয়ায় বালক নিজের মতো করে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বাইরের চাপ যখন শিথিল তখন অন্তরের তাগিদ আপনা থেকেই জেগে ওঠে। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখিনি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে,

দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা।' কবিমনে দানা বেঁধেছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো গল্পের প্লট। তিনি মেজদাদার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করবেন। অর্থাৎ এই একটি পর্ব যেখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি ধারা যুক্ত হল, উন্মুক্ত হল প্রসারিত হল।

এইভাবে আমেদাবাদে কিছুদিন কাটিয়ে বোম্বাইতে আত্মারাম পাণ্ডুরঙ-এর পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে আছে, '...মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়।' ডাঃ আত্মারাম তাঁর তিন মেয়ে আনা, দুর্গা ও মানিক-কে ইংলণ্ড থেকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এরমধ্যে আনার উপর ভার পড়েছিল রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত করে তোলার। এই আনা কবিকে বলেছিলেন, 'একটা কথা মনে রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' এই পর্বেই কবি উপলব্ধির কথা শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' (পৃ ২০৫) বইতে আছে, 'কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো, আমার মনে হয়েছে একটা করুণা favour: কারণ আমি এটা বারবারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা তা সে যে-রকমের ভালবাসাই হোক না কেন আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়সে-ফুল হয়ত পরে ঝ'রে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।'

এইভাবে ছয়মাস কাটিয়ে বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেই যাত্রাপথ ও ইংলণ্ডে অবস্থানকালের বিস্তৃত বিবরণ 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৬ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮৭ সালের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে প্রকাশিত হয়ে এবং পরে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে। কবির জীবৎকালে এই গ্রন্থ আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এখানে কবির সতেরো বছর বয়সে বিলাতযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে একজন বাঙালি সন্তান ইংলণ্ডে গেলে কেমন মনের পরিবর্তনসাধন হয় তার একটি ইতিহাসের কথা এখানে পাওয়া যায়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পুনা স্টীমারে চড়ে বোম্বাই বন্দর থেকে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর কবির কাছে অসহ্য ছিল এই যাত্রা, তার বর্ণনা সেখানে আছে।

এই সময় ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্তী শহর ব্রাইটনে বাস করছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা দেবী। সেখানে পৌঁছে তিনি অনুভব করলেন 'বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।' ব্রাইটনের স্কুলে ভর্তি হয়ে সেখানে কথা, সেখানের মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা, সংগীতশালায় মাদাম নীলসন অথবা মাদাম আল্‌বানীর গান, লোকেন পালিতের সঙ্গে কিছুকাল কাটানোর অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়ে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেননি; কিন্তু বিলাতভ্রমণকালে যে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সঞ্চিত হল তার ফলে তিনি পূর্ণতার পথে আরও একধাপ

এগিয়ে গেলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে কবি বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করেন। লণ্ডনের মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারীতে তিনি খুব ভালো করে ছবিগুলি দেখতেন। সেখানে চিত্রকর টার্ণারের ছবিগুলি তাঁকে বেশ আকৃষ্ট করেছিল। লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শিখতে শুরু করেন। অধ্যাপক হেনরী মর্লের শিক্ষাদানের পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। তিনি এই সময় একটি ইংরেজি গানের স্কুলে গিয়ে গান শুনতেন। ইংরেজি গানের সুর, ধ্বনি ও গান গাইবার বিশেষ কায়দা রপ্ত করেছিলেন। মাত্র দেড় বছর ইংলণ্ডে বাস করে ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রথমবারের বিলাতভ্রমণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বলেছেন—'বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।'

৩০৩.১.৪.৩ : উপসংহার

বাল্যকালে ঠাকুরবাড়িতে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অভিভাবক ও অগ্রজদের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সকলেই যখন ধরে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আর কিছু হবে না; তখন বালককবি স্বমহিমায় অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যজগতে। বিদ্যালয়বিমুখ বালকের কাছে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষক ও অভিজ্ঞজনেরা। ১৮৭৫ সালে মাতৃবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ আরও অমনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। দিদি ও বৌঠানের আদরে যখন আর কিছুই হবার নয়, তখন মেজদাদা প্রস্তাব দেন ব্যারিস্টারি পড়ার। ঘরের জানলা ও ফাঁক ফোকর দিয়ে যে মানুষটি বাইরের প্রকৃতিকে এতদিন দেখছিলেন, সেই মানুষটি এবার স্বাধীনভাবে বাইরে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ, বোলপুরে শুষ্ক লাল মাটির প্রান্তর কিংবা বিদেশের অচেনা জগৎ যাই হোক না কেন, বালক প্রকৃতির এই নানারূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। তখন চলছিল বালকের মধ্যে এক মহাসত্তার জাগরণপালা। পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রমননের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বমানবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা। কবির জীবনের প্রথমবার বিলাতভ্রমণ পর্বে (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০) বেশ কিছু অভিনব সত্য অনুভূত হয়েছিল। তিনি এই প্রথম তুলনামূলক দৃষ্টিতে দুই দেশের রুচি সংস্কৃতি ও প্রথাকে দেখতে পেলেন। অভিভাবকদের নজর ভিন্ন থাকলেও বালক ঠিক তার নিজের কাজটি পূরণ করেই ফিরে এসেছিলেন। বিলাতি মানুষের অকৃত্তিম স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম ও ভক্তি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তাই ব্যারিস্টার হয়ে না ফিরতে পারলেও রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়ের ঝুলি পূর্ণ হয়েছিল বলেই মনে হয়।

৩০৩.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে ভ্রমণ করে কী কী প্রাপ্তিযোগ ঘটেছিল তা সংক্ষেপে লেখো।

খ) বিলাতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কবির অনুভব কেমন ছিল সে কথা বুঝিয়ে দাও।

৩০৩.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থ

মৈত্রেয়ী দেবী — বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় — রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব

নীহাররঞ্জন রায়, (২-য় খণ্ড) — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ — বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

পর্যায় - ২
রবীন্দ্রজীবন : দ্বিতীয় পর্ব (১৮৮১-১৯০১)

একক - ৫
রবীন্দ্রনাথ ও 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বালক' পত্রিকা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৫.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৫.২ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৩০৩.২.৫.৩ : বালক পত্রিকা

৩০৩.২.৫.৪ : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা

৩০৩.২.৫.৫ : উপসংহার

৩০৩.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.২.৫.১ : ভূমিকা

সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে তদানীন্তন ভারতবর্ষের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ছিল উৎকৃষ্টতার একমাত্র নিদর্শন। এই ঠাকুরবাড়ি ও এই পরিবার বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঠাকুরবাড়ি ও পরিবার সমসাময়িক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ, সাময়িকপত্রকেন্দ্রিক এক গুচ্ছ কবি সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সমকালের কলকাতা সমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রধান প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিফলিত জীবনযাপনে তৎপর ছিল এই পরিবারটি। বিভিন্ন স্বাদের পত্রিকা প্রকাশে, পত্রিকায় রচনা প্রকাশে ও পত্রিকা সম্পাদনে বংশ পরম্পরায় আগ্রহ ছিল। আমরা বাঙালি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বাঙালির চেতনা ও চৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও প্রাত্যহিক জীবনধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আলোকপাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে পত্রিকাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন ১৮৮৫ সালে এপ্রিল মাসে মাসিক 'বালক' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন ও সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ছিলেন সম্পাদিকা। 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও গল্প 'মুকুট' এখানে প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ সালে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে 'সাধনা' প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশে তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যকে সাহায্য করেছিলেন। 'পোষ্ট মাস্টার' গল্পটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯০০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় কবি নৈবেদ্য'-এর কবিতা গুলি লিখছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। এই বছরে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' প্রকাশ শুরু হয়। ১৯০৫ সালে 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করেন।

৩০৩.২.৫.২ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের ভাদ্র মাসে। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে এই পত্রিকার বয়স আঠারো বছর। এই পত্রিকা সম্পাদনা করেই ৫৩ বছর বয়সে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সত্তার পরিসমাপ্তি হয়। ইতিপূর্বে চারটি পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা ছিল। এখানে কবির প্রথম ছাপার অক্ষরে রচনা 'অভিলাষ' নামক কবিতাটি আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' শিরোনামে মাত্র বারো বছর বয়সে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ চার বছর ধরে (১৯১১ থেকে ১৯১৪ সাল) এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। আমরা জানি রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র উত্তরাধিকার হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠাকালে এই পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। ডফ সাহেবের হিন্দু ধর্মের প্রতি ও ব্রাহ্মসমাজে প্রতি তীব্র কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র আত্মপ্রকাশ হয়। পরবর্তীকালে ১৮৪৩ সালে এই সভার মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বহুমুখী আত্মপ্রকশের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকা। পত্রিকাটি ধর্মীয় হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সর্বদা স্মরণে রাখতেন এখানে রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। কবি এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন তাই এখানে ঋষি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই বেশি করে। তিনি প্রতিভাবান লেখক, দার্শনিক তাই বলেছেন বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।/অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।' রবীন্দ্রসম্পাদনাকালে অসংখ্য ব্রহ্মসঙ্গীত, নতুন সঙ্গীত, ধর্মীয় প্রবন্ধ, ভাষণ, উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি রচনা করেন। এই পর্বে অধিকাংশ সংগীত 'গীতালী' ও 'গীতিমাল্যতে' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে এই পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিচিত্রমুখী আত্মপ্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরতে পরতে। তবে রবীন্দ্রনাথের একটিও ছোটোগল্প ও উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি; কারণ হয়তো এই পত্রিকা ছিল ধর্মীয় অনুশাসন।

মহর্ষি যদিও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন ধর্ম আলোচনার উদ্দেশ্যেই তবুও সুদক্ষ সম্পাদক আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ও নানান আলোচনাকে পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্থান করে দিয়েছিলেন। এককথায় এই পত্রিকা ছিল বাঙালির আত্মদর্শনস্বরূপ। এই পত্রিকায় লেখকগোষ্ঠীদের মধ্যে ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যন্যজন। কবির বয়স তখন ২৪ বছর পিতা মহর্ষির বয়স তখন ৬৭ বছর। প্রায় ৪০ বছর ধরে সংসারের ভার বহন করে ক্লান্ত। নানা সমস্যা দেখে দিচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের দুর্দিন, কেশবচন্দ্রের অকাল-প্রয়াণ হয়। এই অবস্থায় ১৮৮৪ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজকে সুগঠিত করতে সম্পাদক করে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে; আর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক করে দেন জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে। পরে ১৮৩৩ শকাব্দে ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, গীতিকার ও সুরকার এবং একজন প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক, প্রবন্ধকার, গল্পকার ও অন্যান্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেই তিনি ঠিক করে পত্রিকাকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করবেন। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি তিনি নিরন্তর রচনা করে আমাদের মোহিত করেছেন। ধর্মীয়ভাবের প্রবন্ধ, বিভিন্ন বিষয়ক ভাষণ, উপদেশাবলীর পাশাপাশি 'গোরা' নামক মহাকাব্যিক উপন্যাস তিনি রচনা করেন। এই পর্বে যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'আত্মপরিচয়' অন্যতম। 'তত্ত্ববোধিনী' এমন একটি পত্রিকা যেখানে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল সবথেকে বেশি। যেহেতু বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার স্ফুরণ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ফুটে উঠেছে, তাই এই পত্রিকার কথা স্মরণ না করলেই নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালে সম্পাদক হয়েছিলেন তবুও এই পত্রিকার কথা আমাদের ১৮৬১ থেকে ১৯০১ খ্রি পর্যন্ত আলোচনার স্থান পেয়েছে বিশেষভাবে।

৩০৩.২.৫.৩ : বালক পত্রিকা

ঠাকুরপরিবারের উদ্যোগে এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুর বাড়ি থেকে ঠাকুরপরিবারের ছেলেদের জন্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক বছর চলার পরে তা 'ভারতী'-র মিশে যায় এবং নামকরণ হয় 'ভারতী ও বালক' ১২৯৩ সাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ বালক পত্রিকার লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটক, 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে পরিবেশিত মাসিক 'বালক' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী তখন ছিলেন সম্পাদক। কবি 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও গল্প 'মুকুট' এই পত্রিকার জন্যে রচনা করেন। প্রবন্ধ 'আলোচনা' ও কবিতা শৈশব সঙ্গীত' এই সময়ে প্রকাশিত।

৩০৩.২.৫.৪ : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা

বিদেশী সমস্ত কিছু যে খারাপ তা রবীন্দ্রনাথ কখনও মনে করেননি; কিন্তু বিদেশী যা খারাপ তা তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বৈশাখ ১৩১২

থেকে বৈশাখ ১৩১৪ সাল পর্যন্ত। এই পর্বে আমরা তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখি। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশকে বিভাজন করার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন কবি। তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্বদেশাভিমানকে তিনি সবসময় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই সময় ঠাকুরবাড়ির কর্মপদ্ধতি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বদেশীভাবের জোয়ারে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন 'সখি সমিতি'(১২৯৩), পরে তা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর হাতে পরিণত হয় 'বিধবা শিল্পাশ্রম' রূপে। হিরন্ময়ী দেবী পৃথকভাবে 'মহিলা শিল্পসমিতি' স্থাপন করেন। এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তবে উক্ত সমিতিতে উৎপাদিত কুটিরশিল্পসামগ্রী বিক্রি করার জন্যে সরলাদেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে ৭ নং কর্ণয়ালিস স্ট্রীটে একটি দোকান খুলেছিলেন। পরে কেদারনাথ দাশগুপ্ত যিনি ঐ কর্মকাণ্ডের ম্যানেজার ছিলেন, তিনিই ১৩১১ সালে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে 'ভাণ্ডার' নামকরণ করে একটি পত্রিকা প্রকাশের চিন্তাভাবনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেওয়ার জন্যে। এইসময় কবি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তবুও তিনি বৈশাখ ১৩১২ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কবির দ্বারা সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা ঠিক সাহিত্য পত্রিকা ছিল না। তাই এখানে কবির লেখা উপন্যাস, গল্প প্রকাশিত হয়নি। কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ নিবন্ধ, চিঠিপত্র ও ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম বছর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকলেও ২-য় বছর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন প্রমথনাথ চৌধুরী। তৃতীয় বছর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক ও তার পর থেকে এই পত্রিকার গতিপ্রকৃতি বদলে যায়।

৩০৩.২.৫.৫ : উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘসাহিত্যজীবন সমকালের চারপাশের মনন ও দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল বিশ্বব্যাপী। সাহিত্যচর্চা শুধু নয়, পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও তাকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ চাঞ্চল্য আমাদের প্রত্যয়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কবি 'তত্ত্ববোধিনী','সাধনা', 'ভারতী' 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার' ও কিছুকাল 'হিতবাদী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখেছি আমাদের সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ যিনি প্রদীপ্ত প্রতিভার স্পর্শে আমাদের মুখরিত করে রেখেছেন। হোমার, ভার্জিল, মিলটন, বাল্মীকি, কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রমুখজন পৃথিবীখ্যাত কবি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবিদের কবি, বিশ্বকবি। তাঁর দৃষ্টি ছিল বিশ্বের প্রকৃতি, বিশ্বের ধর্ম বিশ্বের রীতিনীতি নিয়ে। তাই নিবিড় অনুরাগে অসামান্য মনীষার দীপ্তিতে আমাদের কাছে আজও উদ্ভাসিত ও প্রাসঙ্গিক। তিনি একটা যুগএকটি শতাব্দীব্যাপী সাহিত্যচিন্তার ধারক ও বাহক। সাহিত্য ও জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি ছুঁয়ে দেখেননি বা সেই সম্পর্কে মন্তব্য করেননি। কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয়, কথাসাহিত্য, চিঠি, প্রবন্ধ সমস্ত তাঁর স্পর্শে স্বর্ণ রূপ ধারণ করেছে।

৩০৩.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কসূত্রটি কেমন ছিল তা বুঝিয়ে দাও।

খ) 'বালক' পত্রিকা স্বল্পস্থায়ী হলেও ঠাকুরপরিবারের পত্রিকা হিসেবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা আলোচনা করো।

গ) 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সঙ্গে কবির যোগাযোগ কেমন ছিলো তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করো।

৩০৩.২.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

রানী চন্দ — সব হতে আপন

শিশির কুমার মাইতি — সাময়িকপত্র ও রবীন্দ্রনাথ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

একক - ৬

রবীন্দ্রনাথ : 'মানসী' ও 'শিলাইদহ' পর্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৬.২ : মানসী পর্ব

৩০৩.২.৬.৩ : শিলাইদহ পর্ব

৩০৩.২.৬.৪ : উপসংহার

৩০৩.২.৬.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের গৌরবের প্রতীক। তাঁর সৃষ্টি শুধু বাঙালিকে নয়; বরং সমগ্র ভারতবাসীকে জগৎসভায় উচ্চ আসন প্রদানে সদাতৎপর ছিল। ভাবের নতুনত্ব, আঙ্গিকের মৌলিক উদ্ভাবন, চিন্তার প্রাচুর্য্য ও অমিত উদ্ভাবনীশক্তি আমাদের বিস্মিত করে। মূলত বৈচিত্র্যের বহুমুখী প্রবণতা রবীন্দ্রসাহিত্যকে করে তুলেছে বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর গ্রহণ করার শক্তি যেমন ছিল তেমনি ছিল প্রকাশ করবার গভীর বাসনা। যা কিছু প্রচলিত তার থেকে সরে গিয়ে নতুন করে ভাবতে গিয়ে তিনি বারবার ফিরে ফিরেই নতুনের কথা উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তাই এতদিন ধরে সাহিত্যচর্চা করেও সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এতো জনপ্রিয় ছিলেন। সকল দেশের সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের জনমানসের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম, তাই আজও তিনি সকলের কাছে ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। তিনি জগতের সকল নরনারীর চিত্তকে সমানভাবে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যভাবনা ও সৃষ্টিসুন্দর, শ্বাশ্বত ও চিরন্তন।

৩০৩.২.৬.২ : মানসী পর্ব

রবীন্দ্রনাথের যখন পূর্ণযৌবন, সেই সময়ের কবিতাগুলি একত্রিত করে 'মানসী' নামে প্রকাশিত করেন। মানসীর পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত কাব্যকবিতা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কবিতা না হয়ে ওঠার কথা বা আত্মতৃপ্তির কথা বারবার প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে। কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ'। 'সঞ্চয়িতা'-র ভূমিকায় কবি বলেছিলেন, একমাত্র 'কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।' 'মানসী' সম্পর্কে সেখানে বলেছেন, 'মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে...।' অর্থাৎ কবি মনে করতেন প্রকৃতপক্ষে মানসী থেকেই তাঁর কাব্যভুবনের প্রকৃত যাত্রা শুরু।

১২৯৪ সাল থেকে ১২৯৭ সাল পর্যন্ত যে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল তা ১২৯৭ সালের ১০ পৌষ 'মানসী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রায় যাচ্ছেন। প্রথমবার যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, আর দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরে সঙ্গে ১৮৯০ সালের ২০ অগস্ট। এবার অবশ্য যাত্রা করেছিলেন বিদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতিকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করবার বাসনাতেই। মাত্র দশ সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইংলণ্ডের পথে যাত্রা করার সময় কবি ইতালি ও ফান্স হয়ে যান। পথের দুই ধারে আঙুরের ক্ষেত ও মাথায় রুমাল বাঁধা অপূর্ব ইতালীয় সুন্দরীদের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে কবিহৃদয় আনন্দে ভরা ছিল। যৌবনের কবি যৌবনের এমন রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে যান। পাশাপাশি ইতালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ফান্সের শহর ও পল্লীর রূপ থেকে কবি মোহিত হয়ে যান। পর্বত এবং তার গা ঘেঁষে, কখনো বা নদীর কোল দিয়ে পাড়ি দিতে দিতে কবিহৃদয় হারিয়ে যেতো। এই সময়ে রচিত চারটি কবিতা এই মানসীতে স্থান পায়; এছাড়া অধিকাংশ কবিতা গাজীপুরে রচিত, আর কিছু কবিতা দার্জিলিং থেকে রচিত।

গাজীপুরে যাত্রা রবীন্দ্রজীবনে নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম তিনি স্ত্রীকে নিয়ে রোমান্টিক শহরে কিছুকাল কাটাচ্ছেন। গৃহকর্মের পরিধির বাইরে গিয়ে স্ত্রীর সান্নিধ্যলাভ কবিজীবনে একটি বিশেষ প্রাপ্তি। জোড়াসাঁকোর বাড়ির থেকে দূরে গাজিপুরে বসবাস তাই একটি বিশেষ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এছাড়াও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুক্তপ্রাণ মানুষ। কাজের কোনো গুরুভার তাঁর উপর পড়েনি। এই গাজিপুরে অবস্থানকালে কবি ২৮ টি কবিতা রচনা করছেন; যা পরে মানসী কাব্যে স্থান পায়। আফিম বিভাগের কর্মচারী হিসেবে দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায় সেখানে বসবাসের সমস্ত সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে গাজিপুর ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তিনি 'মানসী' কাব্যের সূচনায় বলেছেন, 'বাল্যকাল থেকে পশ্চিমভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব নব ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি, এই পশ্চিমভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত

দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারই মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। ... অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি...। '

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মসচেতন। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এখন নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি এখন দক্ষ স্রষ্টা। তাই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি প্রকাশ করেছেন অন্তরের অনুভবগুলি। পাশাপাশি তিনি গুরুত্ব দিলেন ছন্দের দিকেও। ইউরোপীয় ছন্দের অনুকরণে নবনব ছন্দ সৃষ্টি প্রায়স এই পর্বের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খন্ড, পৃ ২৫০) বলেছেন, "মানসী'র কবিতাগুলির মধ্যে যে-স্তরভেদ আছে, তা কবি স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পর্বের সহিত দ্বিতীয় পর্বের তফাতটা কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'প্রথম পর্বের কবি নিজেকে ঘোষণা করেন অর্থাৎ কারও কাছে দরদ আদায় করবার ইচ্ছেটাই তাঁর তখন প্রবল। দ্বিতীয় পর্বে কবি বেদনাকে অবিকল ব্যক্ত করেন না, তখন তিনি সৃষ্টি করবার জন্য সুখদুঃখের সীমাকে অতিক্রম করে যান...।'

৩০৩.২.৬.৩ : শিলাইদহ পর্ব

রবীন্দ্রজীবনের বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর জীবনের চারটি পর্ব প্রকট এক- কলকাতার জীবন, দুই- শিলাইদহের জীবন, তিন- বীরভূমের শান্তিনিকেতন এবং চার-বিশ্বপথিক জীবন। ইতিপূর্বে কবি পরিবারের সঙ্গে ও পিতৃদেবের সঙ্গে পেনেটির বাগান, হিমালয় ভ্রমণ ও শেষে বিলাতভ্রমণ করলেও সেই যাত্রা ছিল ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন পরিকল্পনার। এবার শিলাইদহে কবি যাত্রা করেন জমিদার হয়ে, প্রজাদের অভিভাবক হয়ে প্রজাদের মতো করে তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ইচ্ছায়।

ঠাকুরপরিবারের তখন জমিদারি ছড়ানো ছিল নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলার মধ্যে এবং কিছুটা অংশ ছিল উড়িষ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহে প্রথম যান ১২৮২ সালে(৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৫ সালে)। অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃদেবের সঙ্গে। সেই বছর ফাল্গুন মাসে পুনরায় তিনি জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহে যান। দাদা বুঝেছিলেন বালকের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর মন। আকাশ-বাতাস-নদীনালা যেদিকেই যান সেই দিক থেকেই তিনি রসদ গ্রহণ করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি গড়ে ওঠার পশ্চাতে, পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত হওয়ার পিছনে এই শিলাইদহের ভূমিকা অনবদ্য। কবি এই প্রথম একা একটি প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেলেন। পরিবারের বেষ্টনীর বাইরে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতন হলেন। গৃহের বাইরে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্যে মানুষের হয়ে কাজ করবার প্রাথমিক প্রস্তুতি হয়ে গেল; বলাই বাহুল্য প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আজীবনের সম্পর্কসূত্র তৈরি হয়ে যায় এইভাবেই। তিনি দীক্ষিত হয়ে যান প্রকৃতি মানুষ ও প্রেম এই মহৎ ভাবনায়। ভরাযৌবনে পরিপূর্ণ পদ্মা কবিজীবনে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে নিয়ে আসে।

কবি সপরিবারে প্রথম শিলাইদহ যান ইংরেজি ১৮৮৯ খ্রিঃ ও বাংলা ১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতার আদেশেই। পিতৃদেবের আদেশ শুরুতে নির্বাসন বলে মনে হলেও পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন তাঁর জীবনেদেবতা তাঁকে এই স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিয়ে আসেন। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র এস্টেটের জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব পান। যদিও আগের থেকে তিনি জমিদারি তদারকি করছিলেন। তবুও পুত্রের ভার লাঘব করার জন্যে মহর্ষি প্রথমে উড়িষ্যার জমিদারি ও সাজাদপুরের জমিদারির ভার পৃথকভাবে তাদের মালিকদের ফিরিয়ে দিলেন ও পরে রবীন্দ্রনাথের উপর থাকলো শুধুবিরাহিমপুর (শিলাইদহ) ও কালীগ্রাম(পতিসর)। হেড অফিস শিলাইদহে রেখে কবি জমিদারির কাজ চালাতে থাকেন। ১৯১৫ সালে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগণা ভাগ করা হল। তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে শিলাইদহে বসবাসের প্রবণতা কিছুটা কমে যায়। এর মধ্যে জমিদারি ভাগ হল; কবির ভাগে শিলাইদহ না পড়ে পড়ল পতিসর(কালীগ্রাম পরগণা)। তারও পরে শিলাইদহের মালিক নিযুক্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাই হোক, কাজকর্মের সুবাদে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে পল্লীবাসীদের কাছে থেকে পাশে থেকে নিবিড় এক আনন্দের পূর্ণতর স্ফূর্তি অনুভব করেছিলেন। মেতে উঠেছিলেন পল্লীবাসীদের উন্নয়নপ্রকল্পে। নতুন নতুন নিয়ম করে মানুষের মন জয় করে নিতে তিনি ছিলেন সকলের কাছেই প্রিয় জমিদারবাবু। পল্লীবাসীদের মনের কোণে জমে থাকা অশিক্ষা, কুসংস্কার, জড়তা, অলসতা সবকিছুকে তিনি সরিয়ে রেখে মানবধর্মের উন্নত পাঠ পড়ালেন। গ্রামীণ জীবনের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করেছেন সর্বত্র। তবে কবির ভূমিকা ছিল মূলত সংস্কারকের। সংস্কারসাধনে তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেন তার মধ্যে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বোপরি তাদের মুক্ত করলেন তাদের মানুষ করে দিলেন। এই পর্বে নতুন পর্ব শুরু হল যার পরিচয় 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পত্রালাপে উঠে এসেছে। কবি এই সময় ২৫২ টি পত্রের ছত্রে ছত্রে সেই অভিজ্ঞতার ও অনুভবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। শিলাইদহে জীবনের কিছুকাল কাটালেও শিলাইদহপ্রীতি ও শিলাইদহের প্রতি তীব্র আকর্ষণ কবিজীবনে আমৃত্যু প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা জানি কবি শান্তিনিকেতনে বাসকালে শিলাইদহের কথা চিরকাল মনে রেখেছিলেন। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে শুরু করেছিলেন তার তপস্যা শুরু হয়েছিল শিলাইদহে।

রবীন্দ্রনাথ যখন পুরাদস্তুর জমিদার ও পল্লীবাসী, তখন তিনি সমান্তরালে তাঁর সাধের 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক, ভারতীর লেখক, পরে শান্তিনিকেতনে আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। 'হিতবাদী'-তে যার সূচনা 'সাধনা'-তে তার পূর্ণতা। সাধনার জন্যে তিনি লিখছেন একটির পর একটি গল্প। ১৮৯১ সাল থেকে তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ চার বছরে ৮৪টি (চুরাশি) গল্প, প্রায় প্রত্যেকমাসে গল্প লিখে চলেছেন। ১৮৯৬ থেকে ৯৭ 'সাধনা' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাসে মাসে গল্প রচনার তাগিদ নেই। তাই এই সময় 'চিত্রা', চৈতালী', 'কণিকা', 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'কথা ও কাহিনী', প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। এই সময় তিনি যাদের কথা লিখছেন তাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন। কল্পনারাজ্যে পাড়ি না দিয়ে বাস্তবকে তুলে আনার প্রেরণা থেকে তিনি রচনা করে চলেছেন। তাই পর্বের রবীন্দ্ররচনা সহজেই চিনে নেওয়া সম্ভব।

৩০৩.২.৬.৪ : উপসংহার

প্রকৃতি মানুষ ও জমিদারি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ব্যস্ত তখন রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব সৃষ্টি করেছেন তা আজও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে আমাদের কাছে। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসর অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেখানের মানুষজনের কাছে বসে তাদের দুঃখ দারিদ্রের কথা শুনছেন। সাধ্যমতো সমাধান করে দিয়েছেন। পিতৃ আদেশ মাথায় করে এলেও ধীরে ধীরে এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন সর্বোতভাবে। এখন যে জগৎ ও জীবনকে দেখলেন তা পূর্বের থেকে সম্পূর্ণতই ভিন্ন। তাই শহর নগর মহানগর থেকে বহু দূরবর্তী এই স্থানে ভিন্ন পরিবেশে অবস্থান করে তিনি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করেছিলেন। এখানেই তিনি পদ্মা, গড়াই, নাগর প্রভৃতি নদীর সাক্ষাৎ পেয়ে পরিপূর্ণ আনন্দ অনুভব করেছিলেন। সুতরাং একজন শহুরে মানুষের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ হল বাংলার চাষী, সাধারণ মানুষ, গৃহস্থ, বাউল, শ্রমিক, বৈষ্ণব ও ফকির সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে কবিও খুশিতে ভরে উঠলেন পূর্ণ হলেন সমৃদ্ধ হলেন।

৩০৩.২.৬.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্রনাথের গাজিপুরে যাত্রায় কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করে এই পর্বে রচিত কাব্যে তার প্রভাব কীভাবে পড়েছিল তার কথা ব্যক্ত করো।

খ) শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

গ) শিলাইদহ পর্বে কবির উপলব্ধির নবতর চেতনালোকের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে লেখো।

৩০৩.২.৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — মানসী

শ্রী প্রমথনাথ বিশী — রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — রবিরশ্মি (১ম ভাগ)

একক - ৭

রবীন্দ্রনাথ ও 'হিতবাদী', 'সাধনা' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৭.২ : হিতবাদী পত্রিকা

৩০৩.২.৭.৩ : সাধনা পত্রিকা

৩০৩.২.৭.৪ : নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা

৩০৩.২.৭.৫ : উপসংহার

৩০৩.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনের আলোচনায় যেমনভাবে গুরুত্ব পেয়েছে পারিবারিক কাঠামো ও স্মৃতির দিক, রচনার দিক, ভ্রমণের দিক একইরকমভাবে গুরুত্ব পায় পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও রচনাপ্রকাশের দিকটিও। কারণ সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ উদ্দীপনা ও আবেগগুলির আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবির বিভিন্ন রচনা নানান স্থানে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কবিতা, চিঠি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অন্যান্য রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পরে পাঠকমহল এক বিস্ময়কর প্রতীভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের মনের ও শিল্পসৃষ্টিকার্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন। শিল্পকল্পনার যে প্রাণবান প্রয়াস দেখা গেল বিভিন্ন রচনাকে কেন্দ্র করে তার থেকে আমাদের প্রত্যয় জন্মাতে থাকে তিনি এক মহান স্রষ্টা। পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার গুরুভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাই জাতীয় জীবনে তাঁর গুরুত্ব সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনের যত রচনা করেছেন তার সিংহভাগ প্রথমে প্রতিকায় ও অনতিবিলম্বে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাই পত্রিকার কথা রবীন্দ্রজীবন আলোচনায় বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩০৩.২.৭.২ : হিতবাদী পত্রিকা

১৮৯১ সালে ৩০ মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই পত্রিকার সম্পাদক হন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার নামকরণ করেন 'হিতবাদী'; অর্থাৎ 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' এই বার্তাকে সামনে রেখে পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি সাহায্য করেন। কিছুদিন চলার পর কৃষ্ণকমল অসুবিধার মধ্যে পড়লে এই পত্রিকার দায়িত্ব নেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের ২১ মে।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ছোটোগল্পের সূত্রপাত এই 'হিতবাদী'কে কেন্দ্র করেই। এখানে 'দেনাপাওনা', 'গিন্নী', 'পোস্টমাস্টার', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হয় ৩০ মে থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে। সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হয়ে প্রতি মাসে একটি করে গল্প রচনার ভার অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি জগৎকে কীভাবে দেখেছেন তার কথা রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যদিও 'হিতবাদী'র সঙ্গে কবির সম্পর্ক মাত্র দেড় মাসের তবুও এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবির আবেগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় একটি বিষয় বলেই বিবেচ্য।

৩০৩.২.৭.৩ : সাধনা পত্রিকা

বাংলা ১২৯৮ ও ইংরেজি ১৮৯১ সালে 'সাধনা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা চার বছর চলেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক কিন্তু পরোক্ষে প্রধান দায়িত্বভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। শেষবছর অর্থাৎ চতুর্থ বছর রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনার পূর্ণভার গ্রহণ করেন। এই চারবছর ছিল রবীন্দ্র সাহিত্য সাধনার উজ্জ্বলতম পর্ব। 'সাধনা' সম্পাদনার মধ্যে দিয়েই সাময়িকপত্র সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। এই সময় ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সাহিত্যের বিবিধ প্রকরণের ভরে ওঠে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সমগ্র বাংলা সাহিত্যসম্ভার। এই পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়েছিল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ সেখানে ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প দিয়েছিলেন; কিন্তু কর্মকর্তারা কিছু লঘুচালের গল্প চেয়েছিলেন তাই কবি হিতবাদীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

'সাধনা'-র প্রথম তিন বছরে ৩৩ টি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ২১০ টি রচনা, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের ১৭০ টি রচনা এবং শেষ এক বছরে ১০ টি সংখ্যায় মোট ১৬৭ টি রচনা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে সম্পাদকের রচনা ৯৯ টি। মূলত রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিদর্শনের কাজে বাইরে থাকবার কারণে ও প্রকাশের বিপুল ব্যায়ভারের কারণে চারটির বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। 'সাধনা' পত্রিকা রবীন্দ্রজীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা একটি মন্তব্য স্মরণ করলেই বোধগম্য হয়। কবি ছিন্নপত্রাবলীতে বলেছেন, 'সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্চে পড়তে দেব না এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার

সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।' কবির জীবনে এই পত্রিকা একটি দায় এবং দায়িত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিল। এই ছিন্নপত্রাবলীতেই তিনি কখনও বলছেন'আমার সাধনা', কখনও বলেছেন আমার সাধনার নিত্য-নৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি...।' 'হিতবাদী'-তে যখন মনের মিল হল না তখন তিনি চাইছিলেন একান্তভাবেই নিজের একখানি পত্রিকা যেখানে তিনি নিজের মতো করেই রচনা প্রকাশ করতে পারবেন। তাই একে একে প্রকাশিত হতে থাকে কাব্য-কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা রচনার সম্ভার।

'সাধনা'-য় প্রকাশ করবেন বলে যত্নসহকারে কবি রচনা প্রকাশ করতেন। 'সাধনা'-য় প্রকাশিত রচনাগুলির যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কথা ও কাহিনী', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সমাজ', 'রাজাপ্রজা', 'শিক্ষা', 'পঞ্চভূত', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি। এই সাধনা পত্রিকার যুগে রবীন্দ্রপ্রতিভা ছিল বহুধাবিভক্ত। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, এই সাধনার পর্বটি কবিজীবনে একটি সাধনার কাল ছিল।

৩০৩.২.৭.৪ : নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ১৮৭২ সালে প্রকাশের পরে চার বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কিছুকাল অনিয়মিত প্রকাশের পর চারমাস অন্তরালে থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদনাকর্মে সাহায্য করেছিলেন। কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে বদলি হয়ে যাওয়া ও বঙ্কিমের অসন্তোষের কারণে এই পত্রিকার অবলুপ্তি ঘটে শ্রীশচন্দ্রের হাতেই।

১৮৭২ সালে যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। তখন এই পত্রিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা কবির ছিল না; কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বুঝেছিলেন যে, এই পত্রিকা ছিল বঙ্কিমের মননশীল সাধনার প্রকাশ। বাঙালির জাতির সার্বিক উন্নতি বিধানই ছিল এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১২৮২-এর চৈত্র পর্যন্ত এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরে ১২৮৩ বঙ্গাব্দ এক বছর প্রকাশ বন্ধ থাকে এবং তার পরে ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক হন। তবে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সর্বময় কর্তা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক পদে ছিলেন, তবে মাঝপর্বে কিছুকাল এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে শীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই বছরের মাঘ সংখ্যা প্রকাশের পর এই পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ আঠারো বছর পর ১৩০৮ সনে, ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপর্য্য পরি অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)'-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন। বঙ্কিম এই

পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'। এই নামকরণের পিছনে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। শুধু বিদ্যাচর্চা বা জ্ঞানচর্চা নয়; পাশাপাশি বাংলাদেশকে চেনার ও জানার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, মাতৃভাষাকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, বাঙালি জাতির সামগ্রিক উন্নতিকল্পে কাজ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন১৩০৮ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ, এই পাঁচ বছর। পত্রিকা সম্পাদনার দিক থেকে এইটি সবথেকে বেশি সময়। তাঁর সম্পাদনায় মোট ৬০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের পাশাপাশি তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি রচনা করছেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'(উপন্যাস), মোট ২৮৩ টি প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত ১১ টি, এছাড়া গল্প কবিতা ছিল। 'ভারতবর্ষ' ও 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলি আমরা পাই তার সমস্ত প্রকশিত হয় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ।

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে শুরুর দিকে পাঠকের সংখ্যা কম থাকলেও পরে তা বৃদ্ধি পায়। বঙ্কিমযুগে যে জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতাচিন্তা ও ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকাশ দেখা যায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, দর্শন, সাহিত্যচিন্তা, সমাজদর্শন ও ইতিহাস চেতনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন এই পত্রিকায় ধরা আছে। সুতরাং এদিক থেকে পত্রিকার গুরুত্ব কম ছিল না।

৩০৩.২.৭.৫ : উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের রচনা প্রকাশ করবার জন্যেই নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহবশত তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশে তৎপর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পাঁচটি সাময়িকপত্রের মধ্যে 'সাধনা' প্রকাশে তাঁর আগ্রহ ছিল সবার উপরে। অন্যান্য চারটি পত্রিকা তিনি অনুরোধ ও উপরোধ রক্ষার্থে যুক্ত হয়েছিলেন। সময়ের নিরিখে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পাঁচ বছর অর্থাৎ সবথেকে বেশিদিন সম্পাদনাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর 'তত্ত্ববোধিনী'-তে তিনি ছিলেন চার বছর, 'ভাণ্ডার'-এ ছিলেন দু'বছর একমাস, 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন একবছর করে। সম্পাদক হিসেবে তিনি সবসময় চেয়েছেন নতুন লেখকদের স্থান করে দিতে, তাদের কথা প্রকাশে উন্মুখ কবি সাময়িকপত্রে লেখা ছাপানোর পূর্বে সংশোধন করে দিতেন। পাঁচটি সম্পাদিত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। যাদের মধ্যে সম্ভবনার বীজ দেখতে পেতেন তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন বেশি করে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্রের যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর।

৩০৩.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির কিছু রচনার নাম উল্লেখ করে সেই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।

খ) 'সাধনা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি বিবরণ দাও।

গ) রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর বিশেষত্বের দিকটি স্পষ্ট করো।

৩০৩.২.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র সমীক্ষা

কানাই সামন্ত — রবীন্দ্র প্রতিভা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য — রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য

একক - ৮

রবীন্দ্রনাথ ও 'সোনার তরী' পর্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৮.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৮.২ : সোনার তরী পর্ব

৩০৩.২.৮.৩ : রবীন্দ্র সাহিত্য কালপঞ্জি

৩০৩.২.৮.৪ : উপসংহার

৩০৩.২.৮.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.২.৮.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাপ্তি যেমন বিশাল, গভীর ও ইঙ্গিতপূর্ণ তেমনি সুন্দর ও মধুর বাণীর বার্তাবাহক। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। অপূর্ব বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়নে মুখরিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রকবিতার প্রতিটি ছত্র। আঙ্গিকগত দিকে নানান পরিবর্তন সাধিত হলেও বিষয়গত দিক থেকে পট পরিবর্তন ছিল তাঁর মহত্বের আর একটি দিক। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', চৈতালী'র মতো কাব্যগ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় কবিতার ভাব ভবনা ও বিষয়বস্তু আর সীমাবদ্ধ থাকলো না। অনায়াসে বেরিয়া পড়ল রুদ্ধদ্বারের আগল ভেঙে। প্রেম প্রীতি ও প্রকৃতি তথা পল্লীপ্রকৃতি এই পর্বে বিষয় থেকে দর্শন হয়ে উঠলো। এমন অপরূপ প্রেমসমৃদ্ধ কল্পনা কল্পনা রবীন্দ্রজীবনে ও কাব্যে কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। বিশুদ্ধ প্রেম ও রোমাণ্টিকতাকে তিনি মূর্তিদানে সচেষ্ট থাকছেন। কবিমনের গোপন তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে যায় উর্বশীর মতো সৌন্দর্য্যপ্রতীক সন্ধানের মধ্যে দিয়ে। তাই পূর্ববর্তী কাব্যধারার থেকে অনেক পরিণতরূপ এই পর্ব। সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি বলেছিলেন "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"

৩০৩.২.৮.২ : সোনার তরী পর্ব

রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে এই বিশেষ সময়টি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কবি বিস্তৃত বাংলাদেশের নদীনালা গ্রাম ও পদ্মাতীরবর্তী জীবনকে সামনে থেকে দেখছেন, এই কাব্যের নাম কবিতাটি(সোনার তরী) পাঠ করলেই বোঝা যায় কবির মনের একটি পরিণতভাব এখানে তৈরি হয়েছে।

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

...ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাইছোটো সে তরী

আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'

পদ্মা ও পদ্মাতীরবর্তী জীবন রবীন্দ্রনাথের আপন কবিধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পদ্মার সঙ্গে পদ্মার গতির সঙ্গে জীবন ও জীবনের স্বভাবকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি পরিণত মনের সন্ধান পেলেন। গতির অনুভব তাঁর এই পর্ব থেকে শুরু হল। ছিন্নপত্রে আছে, 'আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে কেবল গতি ভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়।' নদীর দুধারের তটভূমি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনের চিত্র দেখে তিনি অভিভূত হন। মানধর্ম ও মানবজীবনের এমন বিচিতর রূপ ইতিপূর্বে কবি দেখেননি।

এই সময় কবির গতিবিধিতিনি বিলাতযাত্রা করছেন ২-য় বারের জন্যে ১৮৯০ সালে। 'বিসর্জন', 'মানসী'(১৮৯০) সালে প্রকাশিত হচ্ছে, জমিদারি সূত্রে পতিসরে যাচ্ছেন, 'হিতবাদী' প্রকাশ পাচ্ছে এবং তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত ১৮৯১ সালে। অন্যদিকে 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), চৈতালী' (১৮৯৬), 'কণিকা' (১৮৯৯), 'কথা'(১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'ক্ষণিকা'(১৯০০) উলেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করছেন। প্রতিভার সজীবতার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে যে বিচিত্র ও অভিনব প্রকাশভঙ্গী ও প্রেরণার নিদর্শন মেলে, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কবির বিচিত্র সৃষ্টিক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করেছে বারবার। কবির এই চিরসজীব উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 'সোনার তরী' পর্বে। প্রমথনাথ বিশী বলেছেনগুরবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ' (১ম)পৃ ৮, "সোনার তরী' হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এমন একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কোনো কাব্যসম্বন্ধে বলা চলে নামানসী সম্বন্ধেও নহে, যদিও মানসীর কয়েকটি কবিতা সোনার তরীর প্রৌঢ়তা লাভ করিয়াছে।" সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(৩-য়) বলেছেন,"সোনার তরী'-তে হৃদয়াবেগের আবর্ত থিতাইয়া গিয়াছে এবং কবিচিত্তে গভীরতর প্রশান্তির এবং কবিদৃষ্টিতে গাঢ়তর রসাবেগের সঞ্চার হইয়াছে। কাব্যটির অধিকাংশ কবিতা উত্তরমধ্যবঙ্গে নদীতীরে বাস-কালে রচিত

হইয়াছিল বলিয়া নদীপ্রবাহ ও মানবজীবনপ্রবাহ এক হইয়া গিয়া সোনার তরীতে একটি মুখ্য পভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ...ইহার পরিচয় পাই সোনার তরীর অধিকাংশ কবিতায় এবং সমসাময়িক ছোটগল্পগুলিতে।" 'সোনার তরী', 'চিত্রা', চৈতালী'-তে আমরা একান্ত ভাবধর্মী দার্শনিক ও এক রোমাণ্টিক কবিদৃষ্টির পরিচয় পেলাম। রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে শুচিশুভ্র সংযম দান করেছেন। বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তকে স্পর্শ করেছে এবং তার ফলে বিচিত্র অনুভূতির জন্মলাভ সম্ভব হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল'-এ কবিপ্রতিভার একটি সুসংহতরূপ দেখা গেল। কবিচিত্তের বিভিন্ন ভাব-মননের মধ্যে একটি সমীকরণ-প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এখানেই প্রথম গীতিকবিতার সূত্রপাত দেখতে পাই। মানব ও প্রকৃতির প্রতি একটি আগ্রহ গাঢ়তর হচ্ছে। পরবর্তীকালে 'মানসী', 'সোনার তরী', ও 'চিত্রা' এই কাব্যত্রয়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও জীবনবোধ সবথেকে পরিণত। এই পর্বে কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে পদ্মা, পৃথিবীর রূপ, সাধারণ পল্লী-গ্রাম, উন্মুক্ত প্রান্তর, অতি সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছিল। এককথায় হৃদয়-অরণ্য থেকে কবিহৃদয়ের যথার্থ নিষ্ক্রমণ এই পর্বে। এই পর্বে কবির জীবন সম্পর্কে ধারণাও বদলে যায়। এই পর্বে সুগভীর মর্তপ্রীতি, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি সূচক পঙ্‌ক্তিগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 'সোনার তরী'-র 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতা; 'চিত্রা'-র নাম কবিতা, 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী', 'জীবনদেবতা' প্রভৃতি কবিতা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সৌন্দর্য্য-উপাসনায় যেন কবির প্রতিমাকল্প নির্মিত হয়েছে এই পর্বে। কবির জীবন-দেবতা-দর্শন-এর প্রতিষ্ঠা এই সময় থেকেই। তবে মনে রাখতে হবে কবি কখনো জীবনদেবতার উপর ঈশ্বরতত্ত্ব আরোপ করেননি।

৩০৩.২.৮.৩ : রবীন্দ্রসাহিত্য কালপঞ্জি

সময়	কাব্য সাহিত্য	নাট্যসাহিত্য					কথা সাহিত্য		প্রবন্ধ সাহিত্য	আত্মকথন	
		গীতিনাট্য	কাব্যনাট্য	গদ্যনাট্য/ প্রহসন	সাংকেতিক/ রূপক	নৃত্য নাট্য	উপন্যাস	ছোটগল্প		পত্রসাহিত্য	আত্ম চরিত
১৮৭৭							করুণা				
১৮৭৮	কবিকাহিনী										
১৮৭৯											
১৮৮০	বনফুল										
১৮৮১	ভগ্নহৃদয়	বাল্মীকি প্রতিভা	রুদ্রচন্ড						য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (পত্র প্রবন্ধ)		
১৮৮২	সন্ধ্যাসঙ্গীত	কালমৃগয়া									
১৮৮৩	প্রভাতসঙ্গীত						বৌঠাকুরাণীর হাট		বিবিধ প্রসঙ্গ		
১৮৮৪	শৈশবসঙ্গীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী		প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী								
১৮৮৫									আলোচনা		
১৮৮৬	কড়ি ও কোমল										
১৮৮৭							রাজর্ষি			চিঠিপত্র	
১৮৮৮		মায়ার খেলা							সমালোচনা		
১৮৮৯			রাজা ও রাণী								
১৮৯০	মানসী		বিসর্জন						মন্ত্রী অভিষেক		
১৮৯১										য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী	
১৮৯২			চিত্রাঙ্গদা	গোড়ায় গলদ					শিক্ষার হেরফের		
১৮৯৩										য়ু যা ডা- ২য় খন্ড	
১৮৯৪	সোনারতরী		বিদায় অভিশাপ					বিচিত্র গল্প, ছোটগল্প, কথাচতুষ্টয়	ইংরাজ ও ভারতবাসী		
১৮৯৫								গল্পদশক			
১৮৯৬	চিত্রা,নদী, চৈতালী		মালিনী								
১৮৯৭				বৈকুণ্ঠের খাতা					পঞ্চভূত		
১৮৯৮									কণ্ঠরোধ		
১৮৯৯	কণিকা		কাহিনি					গল্প-১,২			
১৯০০	কল্পনা, কথা কাহিনী, ক্ষণিকা		লক্ষ্মীর পরীক্ষা								
১৯০১	নৈবেদ্য										

৩০৩.২.৮.৪ : উপসংহার

'চিত্রা'-র সৌন্দর্য্যবোধের উচ্ছ্বাস, বাস্তবজীবনবোধ ও আত্মনিরীক্ষণের পর চৈতালি'-র এই 'তপবনাদর্শ' কবিতাগুলি আমাদের মুগ্ধ করে। মূল কাব্যের কবিকৃত ভূমিকায় সেকথা জানা যায়। চৈতালী'র কবিতায় কবির অতীতরোমন্থনের প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়েছে। 'বন ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতা প্রাচীন আদর্শকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন যেন ! কবি নিজেও মনে করতেন কাব্যের মধ্যে কবির যে রূপ প্রকাশ পায় তা যথার্থ রূপ। সেই দিক থেকে সকল কাব্যই কবির সত্য জীবনী। সুতরাং এই পর্বের কবিকে বুঝতে কাব্যপাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'আনন্দরূপের অমৃতবাণী সমগ্র বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে —সংগীতে-নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির এই পর্বের কাব্যে তার প্রতিফলন সবথেকে বেশি।

৩০৩.২.৮.৫ : আদর্শ প্রশ্ন

ক) রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে কবির মনন কেমন ছিল তার পরিচয় দাও।

খ) 'সোনার তরী' পর্বে অন্যান্য রচনা ও তার প্রেরণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

গ) রবীন্দ্রজীবনে 'সোনার তরী' পর্বের গুরুত্ব কোথায় সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৩০৩.২.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা

ক্ষুদিরাম দাস — রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়

প্রমথনাথ বিশী — রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ

পর্যায় - ৩
তৃতীয় পর্ব (১৯০১-১৯২১)

একক - ৯
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা : ১৯০১

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৯.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.৯.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষভাগে যখন বাংলাদেশ এবং ভারত এসে দাঁড়ালো তখন আমাদের দেশ পরাধীনতার অন্ধকারে। ইউরোপীয় সভ্যতার পাশাপাশি আমাদের প্রাচীন দেশজ ঐতিহ্য তখন সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় নয়। তবু ভারতবর্ষের উজ্জ্বল মনীষীরা এবং রবীন্দ্রনাথ সমগ্র দেশবাসী চেতনায় এক উদারনৈতিক মানবিক ভাবনার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়, আত্মশক্তির জাগরণই তার উদ্দেশ্য। এই সময়েই ১৯০২ স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করেছিলেন। এই সময়ই জাপানি ওকাকুরা নতুন চিন্তার সম্মিলিত ধারায় জাপান ও ভারতবর্ষকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, 'Asia is One' বাণীতে সাধারণ মানুষকে। ১৯০০ সালের শেষদিকে জাপান থেকে ওকাকুরা ভারতে আসেন। ১৯০২ সালে নিবেদিতার কল্যাণে ওকাকুরা সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গেও তার সংযোগ হয়। ব্রহ্মবান্ধব, কেশবচন্দ্র সেন এঁরা সকলে মানুষকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত করতে উদ্ভূত করতে আগ্রহী হন। উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের দুঃখ সুখের কেন্দ্রে যিনি ধ্রুব ও নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেছেন তার উদ্দেশ্যে নির্জনে আত্মনিবেদন করেন, একটির পর একটি কবিতা লিখে নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সূচনা হয় এইভাবে। এই নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর পিতৃদেবকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করেন। এই কাব্যগ্রন্থের একটি গুচ্ছ বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায়

প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের আষাঢ় মাসে নৈবেদ্য' পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন — 'নৈবেদ্য কে আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই। তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাহাকে দিয়েছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তো করিবেন, আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবিই রাখি না।" নৈবেদ্যের কবিতার ভাষা মার্জিত, ভাব মহত্বব্যঞ্জক রচনা অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট। জ্ঞান, মনীষা ও অনুভবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। উপনিষদের বাণী, ভারতীয় জীবনবোধের নিবিড় ঐক্য, ধর্মভাবনায় গভীর সত্য নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে সম্মিলিত হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান ও ধর্মের ইতিহাস প্রাচ্য জীবন দর্শন ও শিক্ষা ভাবনা জ্ঞানে, কর্মে সুদৃঢ় উন্নত জীবনবোধের বিকাশ রবীন্দ্রনাথে চিত্তে সম্পূর্ণতা পেয়েছে নানা ভাবনায় তার প্রকাশ। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন ১৯০১ থেকে রবীন্দ্রনাথ দায়িত্ব নেন, ধর্ম, দেশাত্মবোধ ন্যায়নীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির মূলে সমাজের কল্যাণ কামনার স্বরূপ নিহিত এ কথা প্রকাশ করেন বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে- কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা এবং শকুন্তলা নামাঙ্কিত দীর্ঘ প্রবন্ধে। নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন ১৩০৮ এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালের এপ্রিল মে মাসে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় উভয়েই শান্তিনিকেতনে আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় স্থাপনের সম্মতি পেয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধব এই কর্মে উদ্যোগী হয়ে রেবাচাঁদ নামে একটি সিন্ধি শিক্ষক এবং অণিমানন্দ নামে এক খৃষ্টান শিক্ষককে পাঁচ ছয়জন ছাত্রকে (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সন্তোষকুমার মজুমদার ও সুধীরচন্দ্র নান প্রমুখ) নিয়ে বোলপুরে এলেন। এছাড়া শিলাইদহ থেকে এলেন জগদানন্দ রায় এবং শিবধন বিদ্যাণব। এইভাবে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপ পরিগ্রহ করল। ছাত্ররা যেন গুরদেব নামে সম্বোধনের সূত্রপাত করেন। সকলের জন্য নির্বিলাস জীবনযাপন এবং নিরামিষ ভোজন প্রবর্তিত হয়েছিল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ছাত্রদের সঙ্গে কোনো প্রকার আর্থিক সম্পর্ক থাকবে না, তিনি এমনও ভেবেছিলেন যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা শুনে দেশের হিন্দু ধনীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ মত আশ্রমকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করবে। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় কবি উপলব্ধি করলেন যে প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দেশবাসী তেমন শ্রদ্ধা নেই। তাই গ্রীষ্মবকাশের পর থেকে ছাত্রদের কাছ থেকে ১৩ টাকা প্রতি মাসে বেতন নেওয়া ঠিক হল।

গ্রীষ্মবকাশের পর থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের দায়িত্ব নিলেন। এই সঙ্গে সুবোধ চন্দ্র মজুমদার এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। জগদানন্দ রায় গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং কুঞ্জলাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ে অচিরেই যোগ দিলেন। অধ্যক্ষ সমিতিও গঠিত হল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। তাঁর পরিবারে একের পর এক রোগের ছায়া বিশেষত স্ত্রী মৃণালিনী দেবী অল্প কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থতার পর ৭ই অগ্রহায়ণ

১৩০৯ প্রয়াত হলেন। মৃণালিনী দেবীর বয়স ছিল উনত্রিশ বছর, রবীন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ বছর। এই পারিবারিক দুর্যোগ ও শোকের মধ্যেও কবি বিদ্যালয়ের পরিচালনার কথা ভুলতে পারেন নি। এই সময়ে দূরে থাকলেও চিঠি দিয়ে বিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। সিটি কলেজের অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এবং সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষকতা করতে এলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজেই পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব হাতে নিলেন। ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরেজি ভাষাশিক্ষার জন্য সহজ ইংরেজি সোপান তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। মোহিতচন্দ্র সেন, অজিত কুমার চক্রবর্তী তাঁকে পাঠ্যপুস্তক রচনার সাহায্য করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এলে যখনই তিনি সময় পেতেন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সঙ্গী হতেন। ছেলেদের সাহিত্য চর্চা, বিভিন্ন শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি নানা কলাবিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। ক্রমশ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত ভবন এবং নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র কলাভবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। এইভাবে ধীরে ধীরে নির্জনে বোলপুরে প্রকৃতির কোলে কবি মনসিজ এই বিদ্যালয়ের স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ত্রিপুরার রাজার রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে তিনি অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন। নিজের রচিত গ্রন্থের গ্রন্থসত্ত্বও বিকৃত করেন এবং নানাভাবে তিনি বিদ্যালয়টিকে চালু রাখার কায়মনোবাক্যে প্রচেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩০৩.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। বোলপুরের রুক্ষতৃণপ্রান্তরে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যা পরিণত হয়েছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মধ্যে—এই রূপায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তোমার মতামত সংক্ষেপে লেখ।

৩। বিশ্বভারতী বিশ্বের মিলনকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র—এই সম্পর্কে রবীন্দ্র প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো।

[দ্র: আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৩০৩.৩.৯.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১-৪ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

২। রবি জীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল, ১-৯ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩। Rabindranath Tagore, his life and work. E.J. Thompson.

৪। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল — চিত্রাদেব।
ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল — চিত্রাদেব।

একক - ১০

‘গীতাঞ্জলি’র প্রেক্ষাপট ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (১৯১৩-১৯১৪)

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১০.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১০.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১০.১ : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে ‘গীতাঞ্জলি’ এক অমূল্য সম্পদ। এই একটি গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। এই গীতাঞ্জলিতে কবি রবির অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষ করা যায়। প্রথমে তিনি ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে শান্তিনিকেতনে বসে এই রচনার সূত্রপাত করেন। আর পরে এই গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদ ‘Song offering’-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। এখানে আমরা এই নোবেল পুরস্কারের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে ছিলেন তখন থেকে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও অচলায়তনের কয়েকটি গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ‘Song offering’ বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়। এতে গীতাঞ্জলি থেকে ৫৪টি, গীতিমাল্য থেকে ১৫টি, নৈবেদ্য থেকে ১৬টি, খেয়া থেকে ১১টি, শিশু থেকে ৩টি, চৈতালি, স্মরণ, কল্পনা, উৎসর্গ, অচলায়তন থেকে একটি করে মোট ১০০টি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ তা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে লন্ডনে যান। লন্ডনের প্রবাসী ছাত্র প্রমথলাল সেনের সঙ্গে রোটেনস্টাইনের ভালো জানাশোনা ছিল। আর ইতিপূর্বে রোটেনস্টাইনও রবীন্দ্রনাথের ‘মর্ডান রিভিউ’ পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতা অনূদিত ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্প পড়েন। লন্ডনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁর হাতে একখানি ছোট নোট বই দিলেন। এটিই কবিকৃত গীতাঞ্জলি ইংরেজি পান্ডুলিপি। যেটি রোটেনস্টাইনকে উৎসর্গীকৃত। এই গীতাঞ্জলির টাইপ করা কয়েকটি কপি, রোটেনস্টাইন কয়েকজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। এদের মধ্যে আইরিস কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, অক্সফোর্ড অধ্যাপক ব্রাডলি ও ব্রুক অন্যতম। এখানে ‘Nation’ পত্রিকার সম্পাদক এইচ.ডাব্লিউ মেসিংহাম কর্তৃক মধ্যাহ্নভোজনে কবি আমন্ত্রিত

হন। 'লন্ডন' প্রবন্ধে 'প্রবাসী'তে যার বৃত্তান্ত আছে। আর এই সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই আনন্দবোধ করেছেন। এই সভাতেই Yeats সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় ২৭শে জুন ১৯১২। এই সাক্ষাৎকারের কথা ১৪ই আষাঢ় (২৮ শে জুন ১৯১২) একটি পত্রে ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখেন—

"কাল রাত্রে এখানকার কবি Yeats-এর সঙ্গে একত্রে আহার করেছি। তিনি আমার কবিতার কতকগুলি গদ্য তর্জমা কাল পড়লেন। খুব সুন্দর করে সুর করে তিনি পড়লেন। আমার নিজের ইংরেজির উপর আমার কিছু মাত্র ভরসা ছিল না। তিনি বলেন, যদি কেউ বলেন এ লেখাকে কেউ আরোহ্নদ্বদ্ম্নদ্রন্তত্র করতে পারে সে সাহিত্যের কিছুই জানেনা।.... আমার এই গদ্য তর্জমাগুলো Yeats নিজে edit করে একটি introduction লিখে ছাপবার ব্যবস্থা করবেন।"

Yeats ছাড়া স্টপফোর্ড ব্রুক ও ব্রাডলির প্রতিক্রিয়াও একই রকম ছিল। রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধুমহলে পরিচিত করাবার জন্য আরো একটি সভা আয়োজন করেন ৭ জুলাই। যেখানে কবিতা পাঠের পূর্বে কিছু ভূমিকা করে নেন। এরপর ১২ই জুলাই তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' কর্তৃক সান্ধ্যভজে আমন্ত্রিত হন। ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রোকাদেরও হোটেলে সকল বড় বড় সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। যাদের সভাপতি ছিলেন Yeats। তিনি ইংরাজীতে তিনটি কবিতা পাঠ করে ভুয়োশী প্রশংসা করেন, যার অনুবাদ প্রভাত কুমারের রবীন্দ্র জীবনীতে আছে। Yeats-এর এই প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় যা বলেন তা 'ইংল্যান্ডে সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা' (প্রবাসী) প্রবন্ধে বলেন --

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন- আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে- তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবতে পারি এবং অনুভব করতে পারি।... আমি একটি শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্য আমার আশা সার্থক।"

কবি যখন লন্ডনে ছিলেন সেখানে রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আর কেমব্রিজ এসে যার সাথেই কবির দেখা হয় তারা সবাই অভিভূত হন। এই কেমব্রিজ থেকে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস একত্রে বসে গীতাঞ্জলির পাঠ সংস্কার কাজে লেগেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রেভারেন্ট অ্যান্ড্রুজ রবীন্দ্র প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় ইংল্যান্ডের অনেক সুধী ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক মনে করতেন। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান', 'মডার্ন রিভিউ' সহ নানান পত্রিকায় সর্বত্র কবির স্তুতি করা হচ্ছিল।

১ই নভেম্বর ১৯১২ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। যার মুখচিত্র হিসেবে রোটেনস্টাইনের আঁকা রবির একটি স্কেচ ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে কবি আরবানায়, তাই কবির কাছে পত্রিকা একমাস পরে পৌঁছায়। রোটেনস্টাইনের পত্র থেকে কবি জানতে পারেন ম্যাকমিলান কোম্পানি গীতাঞ্জলি প্রকাশে রাজি হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ছয় মাস মার্কিন দেশে কাটিয়ে লন্ডনে ফিরে আসেন ১৯১৩ সালে। 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইংল্যান্ডে ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের সাহিত্যিক মহলে একটি অভাবনীয়

চাঞ্চল্য দেখা দিল। সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিপূর্বে বিদেশি ভাষা থেকে রূপান্তরিত কোন একখানি বই এমনভাবে মানুষের চিত্তকে আকর্ষন করেনি। এক বিশুদ্ধ কাব্য হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হয় গীতাঞ্জলি। নভেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত ইংল্যান্ডের সকল পত্রিকায় প্রশংসা বের হয়। উল্লেখযোগ্য সমালোচনার টাইমস পত্রিকার সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্রে স্থান পায়। এজরা পাউন্ড গীতাঞ্জলীর যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়েছিলেন তা মনে হয় গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমেরিকার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি লিখেছেন-

"ইংরেজি কাব্য এমনকি পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা। আন্তরিক গভীর বিশ্বাসের সহিত আমি এ কথা বলিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে আগমন হেতু পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সখ্য নিকটতর হইয়া আসিল।" (বিষ্ণু দে, ইংরেজিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউন্ড' প্রবন্ধ, দেশ সাহিত্য সংখ্যা)

এভাবেই দেশে ও বিদেশে গীতাঞ্জলি প্রকাশ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

গীতাঞ্জলি বা 'Song offering' প্রকাশ ও নোবেল প্রাইজ পুরস্কার ঘোষণার মধ্যে একবছরের ব্যবধান। বিলাতে রয়েল একাডেমীর সদস্য স্টারজ ম্যুর রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্য মনে করে সুইডিস একাডেমীর কাছে সুপারিশ করেন। কারণ রবীন্দ্র রচনা তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া সুইডিশ লেখক পের হেলস্টর্ম-এরও উৎসাহ ছিল। এই সুইডিস একাডেমিতে একজন বৃদ্ধা ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথের বাংলা পড়তে জানতেন। তখন সুইডিস একাডেমীর সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়া হয়। এছাড়া এই সভায় হেইডেন্সটাম লিখিত বিবৃতি পঠিত হলে রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাপক রূপে স্থির করা হয় ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। ম্যাকমিলনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা নিয়ে সরকারিভাবে খবর পাঠানো হয় ১৪ই নভেম্বর। এসময়ে বিদ্যালয় খোলার জন্য কয়েকদিন পরে (১৬ই নভেম্বর/১৯ কার্তিক) কবি রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি করে চৌপাহারি শালবনে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তারা টেলিগ্রাম পেলেন যে ১৯১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করা হয়েছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রোটেনস্টাইনও অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথ ও তার চিঠিতে প্রত্যুত্তর লেখেন ১৮ই নভেম্বর—"যে মুহূর্তে নোবেল পুরস্কার দানের সংবাদ পাইলাম, তদণ্ডেই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতার স্বতই ধাবিত হইয়াছে।" (রবীন্দ্র জীবনী, ২ খন্ড) ১৪ ই নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে রবীন্দ্র অনুরাগীরা কবিকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে আসবেন বলে স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করেন ২৩শে নভেম্বর। ২৩ শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনের আমরা কুঞ্জে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয় কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।এই সভায় কবি যা বলেছেন তা হল—

"আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসংকোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই।...যারা জনসাধারণের নেতা, যারা কর্মবীর সর্বসাধারণের সম্মান তাদেরই প্রাপ্য এবং জন পরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে।" (সঞ্জীবনী, ২৮নভেম্বর ১৯১৩)

রবীন্দ্রনাথের হয়ে মিস্টার ক্লাইভ সুইডিশ একাডেমি থেকে নোবেল নেন। ২৯শে জুন ১৯১৪ সালে কবিকে কলিকাতার গভরমেন্ট হাউসে নোবেল পুরস্কারের মানপত্র ও পদকাদি দানের জন্য সভা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকের 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধি দেবার সিদ্ধান্ত নেন ২৮ অক্টোবর, সেটি কার্যকরী হয় ১৫ই নভেম্বর সিনেটের অধিবেশনে। তবে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অনেক বিদেশি বন্ধুবর্গ তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে ইয়েটসের অসৌজন্যমূলক নীরবতা, এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রভক্ত গোষ্ঠী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া তাই প্রমাণ করে। এজরা পাউন্ড রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন বার্তা পাঠাননি। নোবেল প্রাইজ পেয়ে কবি শুধু নিজেকেই নয়, সমগ্র বাঙালিকে বিশ্বের নিকট তুলে ধরতে সমর্থ হন। এভাবে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বিশ্বের কবি।

৩০৩.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি রচনা এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করো।

২। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিত্বদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। গীতাঞ্জলি কাব্যের অধ্যাত্মভাবনা ও কাব্যে প্রতিফলিত দর্শন চিন্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করো।

৩০৩.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১-৪ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

২। রবি জীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল, ১-৯ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩। Rabindranath Tagore, his life and work. E.J. Thompson.

৪। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল — চিত্রাদেব।
ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল — চিত্রাদেব।

একক - ১১

রবীন্দ্রনাথ : সবুজপত্র পর্ব (১৯১৪)

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১১.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১১.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১১.১ : ভূমিকা

উত্তর: বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এবং একইসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবনপর্বে 'সবুজপত্র' পত্রিকা এক উল্লেখযোগ্য নাম। ১৩২১ বঙ্গাব্দে ২৫শে বৈশাখ (ইংরেজি ১৯১৪ সালের ৭ মে) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ৫৪তম জন্মদিনে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদক প্রমথনাথ চৌধুরি। পত্রিকাটি প্রকাশে কিছুটা আকস্মিকতা লক্ষ করা যায়। কবির নোবেল সম্বন্ধনাম প্রতিভাষণ নিয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যে হলাহল প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কবি অন্তরে জর্জরিত হয়ে এক প্রকাশ স্থির করেন সাময়িকপত্রের জন্য, আর কিছু লিখবেন না। এ সময় মণিলাল গাঙ্গুলি ও প্রমথ চৌধুরি নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা স্থির করেন একটি নতুন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের এবং এই প্রস্তাব নিয়ে কোলকাতা থেকে মণিলাল গাঙ্গুলি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হন। 'সমস্ত শুনিয়া কবি প্রমথ চৌধুরিকে বলিয়া পাঠান যে, প্রমথ যদি পত্রিকা বাহির করেন তবে তিনি লেখা দিবেন। তদুত্তরে প্রমথ জানান রবীন্দ্রনাথ যদি লেখা দেন, তবে পত্রিকা প্রকাশের দায় তিনি গ্রহণ করিবেন।' (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ:৩৪৬) নতুন কিছুর প্রচেষ্টা কবিকে চিরকালই আনন্দ দিয়েছে, 'সবুজপত্র' প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে কবি এর বিষয় নিয়ে সেরকমই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। প্রমথ চৌধুরি এ সময় লেখা একটি চিঠিতে লিখেছেন- "সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে শুধু চিন্তা করলে হবে না- -কিছু লিখতে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি কনিষ্ঠ হয় তো কিরকম হয়। আকারে ছোট — বয়সেও।" তবে আকারের চেয়ে বিষয় কবিকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে ছিল। তাই চিরযৌবন সবুজ-নবীনের প্রতীকরূপে 'সবুজপত্র' সার্থকনামায় আবির্ভূত হল। পত্রিকায় প্রচ্ছদ ছিল নিরাভরণ গাঢ় রঙের ওপর কালো তালপাতার চিত্র, শিল্পী নন্দলাল বসু।

'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমিতে বহির্ঘটনা ও কবির চেতনা জগৎ দুই গুরুত্বপূর্ণ। 'সবুজপত্র' যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ ভারত শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই এক গভীর সংকটকাল। ইউরোপ অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদী দেশগুলি নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। পুঁজি ও বাজার সংগ্রহের এই অশুভ প্রতিযোগিতাই ক্রমশ দেশগুলিকে ঠেলে দিল মানব সভ্যতার চরম বিপর্যয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে। বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯১৪ সালের ৭ই মে) মাসেই পত্রিকার প্রকাশ এবং যুদ্ধ চলাকালীন 'সবুজপত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। দেশ ও কাল কবিকে সবসময় ভাবিয়েছে। সমগ্র মানবসভ্যতার প্রতি সচেতন ও সহানুভূতিশীল কবি যুদ্ধকালীন বিশ্বরাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি থেকে বিমুখ হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ পর্বে 'গীতাঞ্জলি'র বাণী ও ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কবি চেতনায় সমস্ত জড়তা ও জীর্ণতা ত্যাগ করে সবুজের জয়গানে ব্রতী তখন, তারই প্রকাশ 'সবুজপত্র' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্যে। 'সবুজপত্র'র জন্য তিনি একহাতে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছিলেন। অকদিকে সম্পাদকের চাহিদা ও কবির চিন্তার বিকাশে 'সবুজপত্র' চিরহরিৎ হয়ে উঠেছিল। প্রথম সংখ্যায় একই সঙ্গে 'সবুজের অভিযান' কবিতা, 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ এবং 'হালদার গোষ্ঠী' ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতেও রচনার ধারা অব্যাহত ছিল।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটির প্রথম পর্যায়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দ(১৯১৪) থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ(১৯২২) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন (বিশেষত অর্থনৈতিক) কারণে তিন বছর বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হতে শুরু করে। যদিও অনিয়মিতভাবে তা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সাময়িক পত্রটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭ সালে) বন্ধ হয়ে যায়।

ছোটগল্প: সবুজপত্র পর্ব

'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল সম্পূর্ণ নিরাভরণ- চিত্র, বিজ্ঞাপন, পাঁচমেশালি সংবাদ আলোচনা বিবর্জিত সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে। তবে সাময়িকপত্র মানেই গল্পের চাহিদা অনিবার্য থাকবেই, 'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশের পূর্বে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর গল্প লেখার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ২১শে চৈত্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে পত্র লিখলেন- 'গল্প লেখার আয়োজন অনেকদিন মনের মধ্যে নেই।' 'সবুজপত্র' পত্রিকার জন্য গল্প লেখার তিন বছর পূর্বে তাঁর শেষ গল্প 'রাসমণির ছেলে' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। অর্থাৎ তিন বছর তিন মাসে তিনি গল্প রচনার তাগিদ পাননি মন থেকে। শেষ্পর্যন্ত 'সবুজপত্রের' মাসিক যাহিদা মেটানোর জন্য তিনি আবার গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সময়কাল ছিল গল্পকার রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়, যা 'সবুজপত্র পর্ব' নামে অভিহিত। মোট ১০টি গল্প 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো চলতে পারে-

'হালদার গোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩২১ বঃ)

'হৈমন্তী' (জৈষ্ঠ্য, ১৩২১ বঃ)

'বোষ্টমী' (আষাঢ়, ১৩২১ বঃ)

'স্ত্রীরপত্র' (শ্রাবণ। ১৩২১ বঃ)

'ভাইফোঁটা' (ভাদ্র, ১৩২১ বঃ)

'শেষের রাত্রি' (আশ্বিন, ১৩২১ বঃ)

'অপরিচিতা' (কার্তিক, ১৩২১ বঃ)

'তপস্বিনী' (জৈষ্ঠ্য, ১৩২৪ বঃ)

'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪ বঃ)

'পাত্র-পাত্রী' (পৌষ, ১৩২৪ বঃ)

সবুজপত্রের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতিতে নতুনরূপ পরিলক্ষিত হয়। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরিকে একটি পত্র লিখেছেন- 'এই লেখাগুলি গল্প পিপাসু পাঠকদের বেশ চক্ চক্ করে নেবার মতো হচ্ছে না- এগুলো গল্প না বললেই হয়।' (৮ই জুলাই, ১৯১৪)

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে 'হালদার গোষ্ঠী', হৈমন্তী', 'স্ত্রীরপত্র', 'পয়লানম্বর' গল্পগুলি রবীন্দ্রছোটগল্পসাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। 'হালদার গোষ্ঠী' রবীন্দ্রনাথের তর্কাতীত এক সুমহান গল্প। এই গল্পের নায়ক বনোয়ারির মধ্যে একটি চিরকালীন সমস্যার ছায়া দেখা গেছে। শিল্পীর আইডিওলজি সত্ত্বার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের স্থূল লোকমাত্রা ও স্বার্থপরতার মধ্যে যে সংঘাত বাধে, এ গল্পটি তারই তির্যক আখ্যান। হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তীর মৃত্যুর মধ্যে 'দেনাপাওনা'র নিরুপমা মৃত্যুর সাদৃশ্য আছে। তবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য গড়ে উঠেছে যুগপ্রভাবে। শিল্পী ও সুষমার অপমৃত্যু, বাঙালি মেয়ের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন তার কাছে ধরা দিয়েছে বারবার। হৈমন্তী' গল্পেও তারই শিল্পরূপের প্রকাশ।

আবার বৈষ্টমী' গল্পে ধর্মতত্ত্বের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। দেহের কোথায় একটু পঙ্কতিলক লেগে আছে, অন্তরের মধ্যে কোথায় একটু কলুষকণা সুপ্ত আছে, মানুষ তা জানে না, সামান্য মুহূর্তের অসাধারণতায় সুপ্ত পশু সজাগ হয়। সব শুচিতা সংস্কার পলকে শেষ করে দেয়, জগতের অনন্ত সৌন্দর্য নিমেষে মলিন হয়। ধর্মের আভরণ, ধর্মের আচরণ মানুষকে ধর্মাত্মা করতে পারে না। বৈষ্টমী' গল্পে সেই নিদারুণ ট্র্যাজেডির আভাসমাত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু সবুজপত্রের আশ্রয়ে যুগ-সজাহ মন এখান থেকে একটি নতুন মোড় নিয়েছে। নারীর অন্তর-বেদনা এবং তার প্রতিবাদ পাওয়া গেল 'স্ত্রীরপত্র'র মেজ বউ মৃণাল ও 'পয়লা নম্বর'এর অনিলা চরিত্রে। 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে কাহিনীর থেকে বক্তব্য প্রধান হয়ে উঠেছে। সে বক্তব্য মেজ বউয়ের নয়, মৃণালের, সমগ্র নারীর। তাই আক্রমণের কোথাও আবরণ নেই। হৈমন্তী'র অবক্ষয় মৃণাল স্বীকার করেননি। বিন্দুর বিড়ম্বিত জীবনে চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে তার আত্মদর্শন ঘটেছে। তাই মৃণালের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি- 'আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি।' 'স্ত্রীরপত্রে' রবীন্দ্রনাথের নাগরিক চাতুর্য ও বাকবৈদগ্ধের যে পরিচয় মেলে 'পয়লা নম্বরে'ও তা বর্তমান। উইটের দীপ্তিতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকিত। অনিলা চরিত্রে নারীর আত্মকথন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী মানবী, দেবী নয়। বক্তব্য প্রকাশে অনিলা সমুজ্জ্বল।

'শেষের রাত্রি' গল্পের মধ্যে তীব্র বেদনা ছাড়া প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত নিষ্ঠুর মিথ্যাকে নিয়ে স্নেহাসক্ত মাসি যতীনকে সান্ত্বনা দিয়েছে। যতীনের মন ডাকঘরের অমলের ন্যায় মূঢ় ও অলীককে সে সত্য বলে মনে করে, স্বপ্নকে সে বাস্তব ভাবে। 'সবুজপত্র পর্বে' রবীন্দ্র রচনায় একদিক লক্ষ করা যায়, তা হল অত্যন্ত বাস্তবের পটভূমি। 'অপরিচিতা' গল্পটিও অত্যন্ত বাস্তবঘেঁষা। তবে এর মধ্যে বেদনার একটা ধারা বয়ে চলেছে, যা অন্তবিষয়ী পর্যায়ে পড়ে।

'সবুজপত্র পর্বে' আঙ্গিক ও বিষয়ে ছোটগল্পগুলি পারিবারিক কাহিনীর ঘেরাটোপে প্রকাশিত হলেও যুগ-প্রভাবের বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তি সাপেক্ষতা পার হয়ে বিস্তৃততর শিল্প মর্যাদায় উন্নিত হয়েছে।

উপন্যাস: সবুজপত্র পর্ব

'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়- 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'। 'সবুজপত্রে'র বৈশিষ্ট্য অনুসারে উভয় উপন্যাসে বিষয়বস্তুতে সবুজের অভিযান ও আঙ্গিকে নতুনের স্বাদ দিয়েছে পাঠককে। গদ্যের ভাষায় নতুন রীতির প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের উপন্যাগুলিতেই পরীক্ষা করেছে। যদিও 'চতুরঙ্গ' 'সবুজপত্রে' উপন্যাস আকারে বা স্বনামে প্রকাশিত হয়নি। সাময়িক পত্রের গল্প সাহিত্যের চাহিদায় সবুজপত্রের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে যথাক্রমে 'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'- নামে পৃথক গল্পরূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্প চারটি 'চতুরঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে। যদিও গল্প চারটি একটি অখণ্ড আখ্যানের চারটি অংশ। চারটি চরিত্রের মধ্যে জ্যাঠামশায় জগমোহন উপন্যাসের প্রথম অংশেই মৃত্যুর কারণে দৃশ্যপটের অন্তরালে চলে যায়। অবশিষ্ট তিন চরিত্র - শচীশ, শ্রীবিলাস ও দামিনীর আধ্যাত্মিক দ্বন্দ পরবর্তী তিনটি অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসের বক্তা শ্রীবিলাস নিজের ডায়েরিতে লিখে চলে উপন্যাসের কাহিনী। সে শচীশের সহপাঠী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দামিনীর শেষ জীবনের স্বামী।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চারটি চরিত্র বর্তমান হলেও শচীশকে কেন্দ্র করে বাকি চরিত্রগুলি কাহিনীতে আবর্তিত হয়েছে। জগমোহনের সমস্ত কিছু কর্মপ্রেরণা, আনন্দ শচীশকে ঘিরে; শ্রীবিলাসের বন্ধু প্রেম অন্ধভাবে শচীশকে ঘিরে রয়েছে, দামিনীর কামনাবহ্নি শচীশের জন্যই, আবার তারও অন্তরে শান্তি এসেছে শচীশের জন্যেই। এছাড়া লীলানন্দের বিজয়োল্লাসও শচীশকে পাওয়ায় কারণে। শচীশ জীবনরসিক, সে সব জানতে চায়, সে সব হতে চায়- -তাই তার বেদনা, এত সংশয়, এত সংগ্রাম। তবে দ্বন্দ-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শচীশ ধর্ম তথা জীবনধর্ম-মানবধর্মের মূলে পৌঁছাতে পেরেছে। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে যেন একটি লিরিক বয়েছে, একারণে অনেকে 'চতুরঙ্গ'কে কাব্য-উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। ডায়েরীধর্মিতা ও চলিত ভাষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসেই দেহিয়েছেন।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি 'সবুজপত্রে' ১৩২২ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১১টি সংখ্যায়। পরে গ্রন্থাকারে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৬ সালে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসটি 'সবুজপত্রে' উপন্যাস রূপেই প্রথম থেকে প্রকাশিত হয়। সবুজপত্রের যুগপ্রভাবে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যুগচেতনা-রূপ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে করে নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রূপ

পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা, চলিত ভাষারীতি ও ডায়েরিধর্মীতার অনেকাংশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। চতুরঙ্গের গল্পবক্তা একা শ্রীবিলাস- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলা নিজ নিজ ডায়েরির লেখক; তিনটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত এখানে বিবৃত হয়েছে। মেজো বৌঠান, চন্দ্রনাথ বসু, অমূল্য প্রাসঙ্গিক মাত্র।

উপন্যাসে বিমলা তার নাম সার্থক করেছিল। সতীত্বের গৌরব ও গর্ব ছিল তার অন্তরবাহিরের ঐশ্বর্য। নারী জীবনের পক্ষে যা কঠোরতম পরীক্ষা তার মধ্যে দিয়ে বিমলাকে যেতে হল- অপযশের পসরা মাথায় করে অবশেষে তাকে নরাভরণ রূপে নিষ্ঠুর জগতে একাকী দাঁড়াতে হল। নিঃসন্তান জীবনের একমাত্র সম্বল থাকল আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর মূর্তি। স্বদেশী সমাজের মধ্যে তিনি যেসব গঠনমূলক কর্মের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, নিজেই তার পরীক্ষা শুরু করেন। নিখিলেশ সেই আদর্শবাদী জীবনশিল্পী। দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বপ্নই নিখিলেশের মধ্যে রূপ পেয়েছে। সন্দীপ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। চরিত্র বহুস্তরের প্রকাশ সন্দীপের মধ্যে দেখা যায়।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মধ্যে সাময়িক ও স্থানিক সমস্যার আলোচনা হলেও নিখিলেশের জীবনে ও বাণীতে এমন একটি বৃহতের সুর শোনা যায়, যা ইতিপূর্বে আর কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায়নি।

নাটকঃ সবুজপত্র পর্ব

'সবুজপত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র নাটক 'ফাল্গুনী' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'ফাল্গুনী' নাটিকা প্রকাশিত হয়। যদিও পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে এর নাম ছিল 'বসন্তোৎসব'। সুরুলের নতুন বাড়িতে 'ফাল্গুনী' নাটিকাটি রচনা শেষ করেন ২০ ফাল্গুন ১৩২১ এবং পরদিন আশ্রমবাসীদের পড়ে শুনিয়েছিলেন 'বসন্তোৎসব' নামে। সবুজপত্র যুগের যৌবনের জয়গানের সুরের রেশ 'ফাল্গুনী' নাটিকায় নবযৌবনের দলের অভিযানের রূপ মূর্তি পেল।

'ফাল্গুনী'র উপখ্যান ও রূপক অতি সামান্য ও সরল। বসন্তে নবযৌবনের দল প্রাণের আবেগে ঘরছাড়া হয়ে পড়েছে। দলের মধ্যে প্রবীণ 'দাদা' প্রাণের চাঞ্চল্যে শ্রধাহীন; দাদার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হতে উপাধি নিয়ে বেরিয়েছে। এখনো বাইরের হাওয়া তাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরেনি। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। তবে আশা আছে বয়স যতই বাড়বে ততোই সে অন্যদের মতো কাঁচা হয়ে উঠবে। তিনি উপদেশপূর্ণ চৌপদী রচনা করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করেন, এতে লোকের উপকার হবে। কিন্তু নবযৌবনের দল তাতে কান দেয় না। তাদের নেতা জীবন সর্দার। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হল, জগতের চরকালের যে বুড়োটা যৌবন-উৎসবের অলোটাকে খুব দিয়ে তারপর নিবিয়ে অন্ধকার করে দেয়। তাকে বন্দী করে এনে এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলতে হবে। নবযৌবনের দল যুগে যুগে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দুরাশায় ছুটেছে- গৃহের বন্ধন তাদেরকে বাঁধতে পারে না, পিছন থেকে বিবেচক দাদার দল অবিবেচনার প্রতীক এই নওজোয়ানদের চিরদিনই শাসন করেছে, শাসিয়েছে, হুঁশিয়ার করেছে।

কবিতাঃ সবুজপত্র পর্ব

'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বলাকা' কাব্যের 'সবুজের অভিযান' (২৫শে বৈশাখ,

১৩২১)। এটি 'বলাকা'র প্রথম কবিতা- বাংলাভাষায় নতুন কবিতার জন্ম হল সেদিন। এর পরবর্তী একাধিক সংখ্যায় 'বলাকা' কাব্যের অন্যান্য কবিতা প্রকাশিত হয়।

'যৌবনের পত্র' ('বলাকা'র ১৩ সংখ্যক কবিতা) ১৩২২ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়।

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি' (ঐ, ৩৬ সংখ্যক কবিতা) ১৩২২ বঙ্গাব্দ, কার্তিক।

'ঝড়ের খেয়া' (ঐ, ৩৭ সংখ্যক কবিতা) তদেব।

'রূপ' (ঐ, ১৬ সংখ্যক কবিতা) ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন।

'নতুন বসন' (ঐ, ৩৮ সংখ্যক কবিতা) তদেব।

'শেক্সপীয়ার' (ঐ, ৩৯ সংখ্যক কবিতা) তদেব।

'চেয়ে দেখা' (ঐ, ৪৩ সংখ্যক কবিতা) তদেব।

'যে কথা বলতে চাই' (ঐ, ৪১ সংখ্যক কবিতা) ১৩২২ বঙ্গাব্দ, চৈত্র।

'সবুজের অভিযান'এর কবি চিরনবীন সবুজ সংসদের গুরু, তাঁর মনের যৌবন তিপ্পান্ন বছর বয়সেও অটুট। তাই তিনি লিখেছেন- "ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা!/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!" 'সবুজের অভিযান' থেকে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে একটি নতুন রূপ পেল। 'বলাকা' কাব্যে মোট ৪৫টি কবিতা প্রায় দু'বছর ধরে রচিত ও প্রকাশিত, একদিকে নবযৌবনের আরাধনা যেমন করেছেন 'সবুজের অভিযানে' তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণ সাম্রাজ্যবাদে আগ্রাসনের কথা 'ঝড়ের খেয়া'সহ অন্যান্য কবিতায়। 'সবুজপত্রে'র নাম-পটভূমিকায় 'সবুজের অভিযান' থাকলেও সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির বিশ্বপ্রেক্ষাপটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন চেতনা বর্তমান। 'বলাকা' কাব্যের কবিতায় দু'য়ের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

'বলাকা'র প্রেক্ষাপট জুড়ে যেমন আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গ, তেমনি কবিতাগুলোর ভাষা নির্মাণ, প্রকাশের ক্ষেত্রে আছে সবুজপত্রের প্রণোদনা। 'বলাকা' ব্যাখ্যা ও আলোচনার সূচনাতেই কবি বলেছেন- 'এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি।' 'বলাকা'র ৪৫টি কবিতার মধ্যে ২৬টি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। যৌবনের জয়গান, মহাবিশ্বের চিরস্থির-চিরচঞ্চলের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্রতা ও মানবতার লাঞ্ছনা, প্রেম ও মৃত্যুভাবনা, সৌন্দর্য দর্শন ও ঈশ্বরচেতনা- 'বলাকা'র কবিতার নানারূপ, বিভিন্ন মেজাজ, দার্শনিক বীক্ষার বৈচিত্র্যে, তার মূলে আছে 'সবুজপত্রে'র তাগিদ।

প্রবন্ধ সবুজপত্র পর্ব

'সবুজপত্রে' গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন নতুনের স্বাদ দিয়েছেন পাঠককে, তেমনি প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় 'সবুজপত্র পর্ব' নতুনরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, 'সবুজের অভিযান' ও 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে যে 'চরৈবেতি চরৈবেতি' ভাব লক্ষিত হয়েছে সে ভাবের প্রকাশ এ প্রবন্ধে রয়েছে। বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশকে

ভালোবাসবার যে একতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়, তাই রূপ পায় যা কিছু ভালোমন্দ তাকে নির্বিচারে গৌরবান্বিত করার প্রয়াসে। এই কথা রবীন্দ্রনাথ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। এ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে এ যুগের রবীন্দ্র চেতনার বিভিন্ন মনোবাভাপন্ন একাধিক প্রবন্ধ সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ হল-

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (বৈশাখ, ১৩২১)

'বাস্তব' (শ্রাবণ, ১৩২১)

'লোকাহিত' (ভাদ্র, ১৩২১)

'আষাঢ়' (আষাঢ়, ১৩২১)

'আমার জগৎ' (আশ্বিন, ১৩২১)

'সোনার কাঠি' (জৈষ্ঠ্য, ১৩২২)

'কবির কৈফিয়ৎ' (ঐ)

'ছবির অঙ্গ' (আষাঢ়, ১৩২২)

'স্ত্রী শিক্ষা' (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২২)

'শিক্ষার বাহন' (পৌষ, ১৩২২)

'ছাত্র শাসনতন্ত্র' (চৈত্র, ১৩২২)

'আমার ধর্ম' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪)

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়সহ একদল রবীন্দ্র-সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রসাহিত্য বাস্তবশূন্য। এর প্রত্যুত্তরে ও পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' প্রবন্ধটি রচনা করেন। সাহিত্য বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা বলতে কী বোঝায়, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের বস্তু কী' সে বিষয়ের আলোচনা করলেন এ প্রবন্ধে। তাঁর মতে সাহিত্য আসল বস্তু যা পাঠককে খোঁজে সেটি হচ্ছে রসবস্তু। রস জিনিসটি রসিকের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে সাহিত্যিক বা রসিক না হলেও চলে। রসের মধ্যে নিত্যতা আছে, বস্তুর মধ্যে তা নেই।

'লোকহিত' প্রবন্ধে বলেছেন সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য সাহিত্য রচনা, লোকের হিতের উদ্দেশ্য তা রচনা করা নয়। 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধে তিনি লোকসাহিত্যে যে কথার আভাস দিয়েছিলেন, তা-ই 'লোকহিত' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বললেন। তাঁর মতে লোকসাধারণের জন্য বিশেষভাবে যে লোকসাহিত্য ভদ্রসমাজে সৃষ্টি করবেন তা সাহিত্য পদবাচ্য হবে না।

বাস্তববাদের সমালোচনা করতে গিয়ে আদর্শবাদের সমর্থন হল 'বাস্তব' ও 'লোকহিত' প্রবন্ধদ্বয়ে। কিন্তু তিনি তৃপ্ত হলেন না। তাই তিনি 'আষাঢ়' শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন বিজ্ঞানীর পক্ষে দর্শন যেমন অনধিগম্য, দার্শনিকের পক্ষে বিজ্ঞান তেমনি অবোধ্যগম্য, কেউ কারও ভাষা বোঝে না। অথচ দর্শন ক্রমে এতই Objective বা বাহ্যবিষমাশ্রয়ী হচ্ছে ও বিজ্ঞান ক্রমে Subjective বা আত্মপ্রত্যয়বাদী হয়ে উঠছে যে কেউ কাউকে অস্বীকার কররতে পারবে না।

'আমার জগৎ' প্রবন্ধে কবি নববিজ্ঞানীদের আপেক্ষিকতত্ত্ব নিজের মতো করে সাহিত্যের ভাষায় আলোচনা করলেন। সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতার বাদানুবাদের কারণে 'কবির কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটি রচিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় চিত্রকলা ষড়ঙ্গ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন 'ভারতী' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের যেসব প্রশ্নের উদয় হয়, তা-ই 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করলেন।

শ্রীমতী লীলা মিত্র কবিকে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধ একটি পত্র লিখে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধটি লেখেন। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বললেন যে বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

'ছাত্র শাসন' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তৎকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের ক্লাসে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যে ছাত্রদের বিরোধিতা ও তাঁকে মন্তব্যটি প্রত্যাহার করতে বললে তা না করলে সিঁড়ি থেকে নামার সময় সেই সকল ছাত্রদের হাতে অধ্যাপককে প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ একজন ছাত্র দরদী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তবু ছাত্রদের এরূপ আচরণের বিরূপ আলোচনা করেছেন তিনি।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মের সমালোচনার কথা এখানে বলেছেন। সাধারণ মানুষ যে অর্থে ধর্মকে বোঝে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ধর্মের কথা বলেননি। তিনি কবি- তাঁর কবিধর্ম বা অন্তরাত্মা কাব্যের মধ্যে দিয়ে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে, কী প্রেরণায় তাঁর চিত্তবীণা ধ্বনিত হয়েছে সে কথাই এ প্রবন্ধে বলেছেন।

এছাড়া 'সবুজপত্রে'র বিভিন্ন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্র, গান -ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। কবি চেতনার প্রায় চরমতম পর্যায়ে সবুজপত্রের আবির্ভাব। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন পর্বগুলি এ সময়কালে দেখা যায়। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে 'সবুজপত্র পর্ব' নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

৩০৩.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যকর্মের আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে এই পর্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। সবুজপত্র পর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্র ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব নির্দেশ করো।

৩। সবুজের অভিযান কবিতা বলাকার কাব্য সবুজপত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে—আলোচনা করো।

৩০৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন — ক্ষিতিমোহন সেন।

২। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন — প্রমথনাথ বিশী।

৩। জোড়াসাঁকোর ধারে — অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একক - ১২

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সমকালীন দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রবীন্দ্র কবিসত্তা (১৯১৮-১৯২০)

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১২.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১২.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১২.১ : ভূমিকা

উত্তর: ১৯১৭-১৯২০ সাল রবীন্দ্র জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন কাটছে। রবীন্দ্র চিন্তা চেতনায় তার প্রভাব দেখা যায়। কবির মনের অবস্থাও ভালো নয়, কেননা তাঁর মনে প্রাণে বিচিত্র বিষয় ও বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় দেখা যায়। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেন। তাঁর জীবনে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯১৮ সালে বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি রবীন্দ্রজীবনে বিশ্বভারতী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯১৮ সালের গোড়া থেকেই কবি প্রায় শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। মাঝে মাঝে দু -একবার কলকাতা গেছেন। এই সময়য়ে অন্য সাহিত্য সৃষ্টি নেই বললেই চলে। একখানি পত্রে তিনি লিখেছেন -

"মনের ভিতরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে গেছে যে কোনো কাজই করতে ইচ্ছে করেনা।"

চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৫, ২০ মাঘ ১৩২৪

কবির মনের অবস্থা ভালো না থাকাতে তিনি মাঝে মাঝে নিজ রচনার ইংরেজি অনুবাদ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে 'অচলায়তন' ভেঙে 'গুরু' রচনা করেন, এই সময়ে তিনি একটি মাত্র 'বিজয়ী' কবিতা লেখেন।

১৯১৮ সালে কবি কখনো কলকাতায় গেছেন আবার কখনো কলকাতা থেকে তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। শান্তিনিকেতনে থেকে চৈত্র মাসের (১৩২৪) শেষাশেষি কবি যখন কলকাতায় এলেন কবির কাছে আছেন কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ। এন্ড্রুজ সাহেব কয়েকদিন হল ফিজি দীপ থেকে ফিরেছেন পথে অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসেন।

কবি বাইরের প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে মিশে যান। মনের অবস্থা ভালো না থাকায় বিদেশ যাওয়ার আয়োজন করেন। সঙ্গে যাবেন নগেন্দ্রনাথ ও এন্ড্রুজ সাহেব। ১৩২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম রচনা 'পলাতকা'। 'পলাতকা' রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর উতলা উদাস মনের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় বসবাস করে তাঁর বিদেশ যাওয়ার সুখস্বপ্ন দেখছেন কিন্তু তাঁর ভাগ্য পরিসরে বিদেশ যাওয়া হল না। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আমেরিকার মিথ্যা অভিযোগে কবি বিরক্ত হলেন এবং বিদেশ যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন।

১৯১৮ সালে বিচিত্র বিষয় ও ঘটনার পাশাপাশি কবির জীবনে অত্যন্ত দুঃখের চিত্র ভেসে উঠল। কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু (১৬ই মে ১৯১৮)। এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে ভারাক্রান্ত করেছে কিন্তু তিনি সেই মনোব্যথা প্রকাশ করতে পারেনি। 'পলাতকা' (১৩২৫) কাব্যের ছত্রে ছত্রে তিনি বেলার মৃত্যু চিত্র প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র জীবনে উদাস মনের বিচিত্র ভাবনা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মুক্ত পরিবেশে ভাগ করে নিয়েছেন -

"বিদ্যালয়ে আজকাল মাস্টারি করে থাকি তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে।" (রবীন্দ্রজীবনী-২, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কবির মনে বিচিত্র-বিষয়ের অবতারনা ফুটে ওঠে। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র আসে। অবাঙালিকে কিভাবে বাংলা শিখতে হবে সে সম্বন্ধেও কবি পথ প্রদর্শন করেছেন। ছেলেদের জন্য 'অনুবাদচর্চা' নামে বইটার পত্তন করেন এই সময়ে। মোটকথা কবির মনে আনন্দ ফুটে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে আমেরিকা না গিয়ে ভালোই হয়েছে। এই ভালো হওয়াতেই বিশ্বভারতী পরিকল্পনার প্রকাশ দেখা যায়। ১৯১৮ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর কলকাতা ও ঝরিয়ায় প্রবাসী গুজরাটিদের অনেকগুলি ছেলে আশ্রমে বিদ্যার্থী হয়ে আসে। শান্তিনিকেতন যে তার বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমানা ভেঙে বাইরের ছাত্রদের আহ্বান করতে পারছে, এই ঘটনা কবির মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিল। পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পূর্বে কবি একদিন এন্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথকে বার্তা দিলেন শান্তিনিকেতনকে ভারতীয়দের শিক্ষা কেন্দ্র করে তুলতে হবে। কবির এ ভাবনা নতুন বা আকস্মিক নয়। ১৯১৬ সালে আমেরিকার শিকাগো থেকে কবি রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন (২৮ অক্টোবর) সেই পত্রেই এই আদর্শের কথা অতিস্পষ্ট আকারে ফুটে উঠেছে-

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। ওইখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে। ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন খঞ্জের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" [চিঠিপত্র-২, পৃষ্ঠা:৫৫-৫৬]

পুজোর সময় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় কবি রথীন্দ্রনাথ ও এন্ড্রুজকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা আসলেন। সেই সময় কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে অনেকগুলি গুজরাটি ব্যবসায়ী কবির সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম তাঁদের সামনেই বিশ্বভারতী পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন।

তাঁদের সম্মতিতে কবির মন উৎফুল্লিত হয় এবং কবি বিশ্বভারতী গড়ে তোলার জন্য সকল প্রচেষ্টা সাথে নিয়ে অবশেষে ৭ই পৌষ উৎসবের পরদিন (৮ই পৌষ) মহাসমারোহে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পত্তন করলেন। সেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ই হল রবীন্দ্রসৃষ্ট ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশের মুক্তাঙ্গনে গড়ে ওঠা একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

১৩২৫ বঙ্গাব্দ, কবির বয়স তখন ৫৮। সুদীর্ঘ এই জীবনে বহিঃপ্রকৃতির টান বারবার তাকে ভ্রমণ পিয়াসী করে তুলেছে। দেশ বিদেশে ভ্রমণের সুযোগও এসেছে অসংখ্যবার। শীতের মাঝামাঝি কবির জীবনে দ্বিতীয়বার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সুযোগ আসে। ব্যাঙ্গালোর- মহীশূর নাট্যনিকেতন এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান রায়বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, তাঁরই আমন্ত্রণে কবি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারত সফরে পাড়ি দেন। তাঁর এই সফরের মূলত দুটি উদ্দেশ্য ছিল। এক, শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও যাওয়া। দ্বিতীয়, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর নতুন চিন্তাভাবনাগুলি জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করা।

প্রায় তিন মাস সময় তিনি দক্ষিণ ভারতে কাটান। তাঁর সফর তালিকা ছিল যেমন দীর্ঘ, তেমনি ঘটনাবহুল। কোয়েম্বাটুর, পালঘাট, সালেম, তিরুচিরাপল্লী, কুম্ভকোনম, তাঞ্জোর, মাদুরাই, ইত্যাদি প্রায় সকল দর্শনীয় স্থানই তাঁর ভ্রমণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মহীশূর ভ্রমণকালে তিনি বেশকিছু সময় শৈলশহর উটিতে বসবাস করেন। এখানে গোয়া থেকে চার্লস এন্ড্রুজ ও হায়দ্রাবাদ থেকে নগেন্দ্র গাঙ্গুলীর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

দেশ বিদেশ যেখানেই কবি সফরে গিয়েছেন পেয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। জাতি- ধর্ম- বর্ণ- ভাষা নির্বিশেষে তিনি সকলের রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণ ভারত সফরেও তাঁর ব্যাতিক্রম হয়নি। প্রথমে তিনি ব্যাঙ্গালর চারুশিল্প উৎসবে যোগদান করেন। এখানে বিপুল উল্লাসে কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কবি তাঁর 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'তপোবন' প্রবন্ধের বক্তব্যই এখানে নতুনভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মহীশূর রাজ্যে বসবাসকালে সেখানকার শিল্প স্থাপত্য কীর্তি গুলি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। মহীশূরে নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শন কালে সম্বর্ধনার পাশাপাশি সেখানকার ছাত্ররা শান্তিনিকেতনের উন্নতিকল্পে অর্থদান করেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকটি তর্জমা করে শোনান। মহীশূর ভ্রমণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেন তাঁর লেখায়। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আকৃতি প্রকৃতি বর্তমান কালের সংস্পর্শে যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মহীশূর ইউরোপকে গ্রহণ করেছে তবে তা ভারতবর্ষের অস্তিত্বকে খর্ব করেনয়। ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও ইউরোপীয় শিক্ষা এই দুইয়ের আদর্শ সংমিশ্রণ ঘটেছে মহীশূরের সংস্কৃতিতে।

এরপর সালেমে কবি ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র (Centre of Indian Culture) প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এখানকার ছাত্রসভা ও সাহিত্যসভা মিলে কবিকে একটি সুন্দর রৌপ্যমন্ডিত মানপত্র দান করেন। এই সভায় তিনি 'কর্ণ- কুন্তি সংবাদ' এর অনুবাদ পাঠ করেন। তিরুচিরাপ্পলীর সভায় সংবর্ধনার পর তিনি 'Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এখানকার নৌকা উৎসব দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। দক্ষিণ ভারতের নতুন নতুন দৃশ্য, নতুনতর সৌন্দর্য কবি সত্তায় সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। কুম্ভকোনমে স্থানীয় একটি কলেজে অভ্যর্থনার পর 'The Spirituality in The Popular Religion in India' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঞ্জোর

যাত্রা কালে একটি স্টেশনে কবিকে স্থানীয় লোকেরা মানপত্র ও প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুসারে পূর্ণকুম্ভ দান করে সম্মান জ্ঞাপন করেন। তাঞ্জোরে তিনি রায় বাহাদুর বন্দ্যয়ারের বাসায় অতিথি রূপে কিছুকাল বাস করেন। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান ও স্থানীয় ক্লাবগুলি পরিদর্শন করেন। সরকারি ট্রেনিং কলেজে 'Message of The Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। স্থানীয় ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের কয়েকটি দৃশ্য ও 'শকুন্তলা' নাটকটি অভিনয় করেন।

মাদুরাইতে আমেরিকান কলেজ হলে অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় 'Message of The Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দীর্ঘ কয়েক মাসের পরিশ্রমে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় তিনি দেওয়ান গনপতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'The Spirit of Popular Religion in India' ও 'Education in India' নামে দুটি বক্তৃতা দেন। এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। এরপর কবি ও এন্ড্রুজ মদনপল্লীতে কিছুকাল অতিবাহিত করে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যান। সময়টি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন রাজনৈতিক দলাদলি, অন্তরদ্বন্দ্ব, এবং তাঁর মধ্যে কবি ঠিক কোন মতাদর্শকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে অনেক বাদ বিবাদ ঘটে। এসময় পাটেলের আন্তর্জাতি বিবাহ নিয়ে সারাদেশ জুড়ে আলোচনা চলছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অসবর্ণ বিবাহকে আন্তরিক সাধুবাদ জানান। কবির এই অনুমোদনকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজে একটা বিরুদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায়। ১৯১৯, ৪ ঠা মার্চ, সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি এভাবে দিয়েছেন, 'আমি বিশ্বের কবি'। চিরকাল সেই বিশ্বমানবের জয়গাথাই তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

মহীশূরে থাকাকালীন মিথিক সোসাইটিতে বাউল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'Folk Religion of India' পাঠ করেন। কোন জাত বা সম্প্রদায় যে নীচ নয়— একথাই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। মাদ্রাজে অবস্থানকালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর রূপে তিনি 'Education'– 'The Message of The Forest' ও 'The Spirit of Popular Religion in India'- এই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া কয়েকটি কলেজে 'গান্ধারীর আবেদন' এর ইংরেজি তর্জমা 'Mother's Prayer' পাঠ করেন। চৈত্রের প্রথমেই কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে এম্পায়ার থিয়েটারে শিক্ষা সম্পর্কে "The Centre of Indian Culture" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বিলাতে প্রচলিত দর্শনী দিয়ে বক্তৃতা শোনবার প্রথা এই প্রথম কলকাতায় প্রচলন হয়। এর পরবর্তী সপ্তাহে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধগুলিতে বিশ্বভারতীর শিক্ষার আর্দশ ব্যক্ত হয়। সেই শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষা যা সত্য কে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষের মননশক্তি আজ ধর্ম ও জাতীর ভেদবুদ্ধিতে বিনষ্ট প্রায়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার ধারাকে রক্ষা করতে হলে নানা বিভাজনের মধ্যে সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কবি এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন যা পরদেশীয় আদর্শে নয়, সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ধাঁচে গড়ে উঠবে। যে বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, গো-পালন বিদ্যা এই সকল প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে মানুষের মতন মানুষ করে তুলবে। এই আদর্শ শিক্ষাঙ্গন কে তিনি 'বিশ্বভারতী' নামে আখ্যায়িত করার প্রস্তাব করেন।

চৈত্রের শেষদিকে কবি কিছুদিনের জন্য কাশী সফরে বেরিয়ে পড়েন। নববর্ষের সূচনায় কবি মনে আবার নতুন নতুন সুর- তাল-ছন্দের আলোড়ন জেগে ওঠে। এইসময় 'শান্তিনিকেতন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। চারপৃষ্ঠার কাগজে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাটি যেন ঘরের লোকের আলাপচারিতা। 'লিপিকার' গদ্য কথিকাগুলির রচনা এই সময়েই। কথিকাগুলি অর্থমূলক। এতে শ্লেষ আছে।

সমগ্র ভারতবর্ষ তখন রাওলাট কমিটির প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। গান্ধীজি এই সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দেন। তিনি 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের পথ বেছে নেন, এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে হলে ব্যক্তির অন্তঃকরণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য হতে হয়। তাই, ১৯১৯ সালে গান্ধীজি অহিংস আন্দোলনের ডাক দেন, যার মূল মন্ত্র আঘাত পাওয়া, কিন্তু আঘাত না দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিধির বাইরে থেকে দূরদ্রষ্টার ন্যায় এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা গুলি লক্ষ্য করলেন। এই বিষয়ে শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজিকে একটি খোলা পত্র লেখেন তা ১৬ এপ্রিল 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' এ প্রকাশিত হয়।

১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানাবাগে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। 'মার্শাল' আইন অনুসারে পাঞ্জাবের সমস্ত সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম বন্ধ ছিল। তাই এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী কবির অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ কালীন সময়ে কবি শান্তিনিকেতনের দেহলীতে ছোট্ট, খুপরি ঘরে বসে বাতায়ন বাতায়নিকের পত্র লিখতেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের ঘটনা কবির কানে আসে। দেশের এই নিদারুণ অপমানের দিনে তিনি নিরুত্তাপ থাকতে পারলেন না। ৩০ শে মে তিনি তার 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করে লর্ড জেমস্ফোর্ডকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি ১ লা জুনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম সমগ্র ভারতবাসী জানতে পারে পাঞ্জাবে কি অত্যাচার ঘটে গেছে, দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রগুলিতে কবির 'নাইট' উপাধি ত্যাগ ও আনুষঙ্গিক ঘটনার অনেক সমালোচনা করা হয়েছিল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ও কবি স্বয়ং সাহিত্য পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন। ধর্মধার রাজগুরু বৌদ্ধদর্শন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য সংস্কৃত ও পালি, কপিলেশ্বর মিশ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ, ক্ষিতিমোহন সেন হিন্দিসাহিত্য, রথীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্ব, পন্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দুস্থানী সংগীত, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গানের অধ্যাপনার ভার নিলেন। চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রমুখের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সূচনা হলো।

বিশ্বভারতীর আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি ও নতুন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্পর্কে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় কবি নিয়মিত লিখতেন। আশ্রমে নতুন বিজলিবাতির ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনায় অনেকে আশ্রমের আশ্রমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা ও বিজ্ঞানকে একঘরে করে রাখার পক্ষপাতী নন। পূজাবকাশে বিদ্যালয় কিছুদিনের জন্য বন্ধ হল। ছুটির পূর্বে আশ্রমে 'শারদোৎসব' নাটকটি অভিনীত হয়। কবি সেখানে স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় ছিলেন। পূজার ছুটিতে কবি, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, দীনেন্দ্রনাথ ও তার পত্নী কমলা দেবীর সঙ্গে শিলং পাহাড়ে যান। শিলং এর Brookside এ তারা একমাস যাবৎ ছিলেত। পাহাড় থেকে ফিরে তিনি উত্তরায়ণে বসবাস শুরু করেন।

কবি শান্তিনিকেতনে বুদ্ধিবৃত্তির সাথে সাথে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের কথাও বলেন। তিনি মনে করতেন আনন্দের প্রকাশ এক অর্থে জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ রূপ। সংগীতকলার সাথে সাথে মনিপুরী নৃত্যকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। কবি এই সময়ে কিছুদিনের জন্য সিলেটে যান। শ্রীহট্ট কলেজের ছাত্রদের আহবানে সেখানে একটি বক্তৃতা রাখেন।শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব ও মাঘোৎসব বহু পুরাতন ছাত্রসমাগমে আনন্দমুখর হয়ে উঠল। এই সময় কবি 'অরূপরতন' নাটকটি লেখেন। পাশাপাশি চলতে থাকে 'কথিকার' গল্প বলা।

১৩২৭ বঙ্গাব্দ, বিদ্যালয়ে এ বছর তিন মাসের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি থাকে। কবির আহ্বান আসে সুদূর গুজরাট থেকে। আমেদাবাদ থেকে মহাত্মা গান্ধী গুজরাট সাহিত্য পরিষদ সভার নিমন্ত্রণ পাঠান। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কবি, অ্যান্ড্রুজ, সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, ক্ষিতিমোহন সেন ও তরুণ ছাত্র প্রমথনাথ বিশীকে নিয়ে গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করেন। আমেদাবাদে তারা মহাত্মা গান্ধীর সাবরমতী আশ্রমে ও আম্বালান সারাভাই এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ২রা এপ্রিল গুজরাট সাহিত্য সভায় কবি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। পশ্চিম ভারত সফরকালে তিনি ভাবনগর লিমডি, নাদিয়াড ও বরোদা ভ্রমণ করেন। লিমডির রাজা বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে অর্থ দান করেন। বরোদায় নারীসভা, অন্ত্যজ সভায় আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এরপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। তবে এরই মধ্যেই কবি মন শান্তিনিকেতনের একঘেঁয়ে কাজ থেকে একটু অবকাশ নিয়ে প্রকৃতির কোলে একাত্ম হতে চাইছে।

আবার শুরু হয় বিদেশ যাত্রার আয়োজন। এই নিয়ে কবি চতুর্থবার ইউরোপ পাড়ি দেন। এইবার তার বিদেশ সফরের সঙ্গী হন রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী। ইউরোপ যাত্রাকালে বোম্বাইতে বোমানজির বাড়িতে দুই দিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তার সাথে স্যার জামশেদজি ও স্যার স্ট্যানলি রিড দেখা করতে আসেন। ১৫ই মে, ১৯২০ বোম্বাই থেকে জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কবি এসময় 'শান্তিনিকেতন' উপদেশ মালার তর্জমা করেন। পরে এটি 'Thought Relics' নামে প্রকাশিত হয়।

কবি মনে এই সময় লেখা ছাড়াও নানা রাজনৈতিক চিন্তা চলছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে যে হান্টার কমিটি গঠিত হয় তার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসর পর দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই সকল কিছুর প্রভাব পড়ে কবির সংবেদনশীল মনে, যার প্রতিফলন ঘটে এ সময়ে লিখিত কবির পত্রধারায়। ৫ই জুন ইংল্যান্ডের প্লিমাউথ বন্দরে জাহাজ ঘাটে পৌঁছায়। দীর্ঘ তিন বছর পর বন্ধু পিয়ারসনের সাথে কবি সাক্ষাৎ হয়। লন্ডনে পৌঁছালে রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ সহ সকলকে একটি ভালো হোটেলে নিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের আগমন সংবাদে কবির বন্ধুগণ ও অন্যান্য দর্শনাভিলাষী তার সাথে সাক্ষাৎ করেন. তবে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগের কারণে এবারে আত্মীয়তা ও উচ্ছ্বাসে ভাটা অনুভূত হয়। রাজকীয় সম্মান প্রত্যাখ্যান করা তাদের চোখে অপরাধের সামিল।

কবি ও রোদেনস্টাইনের মধ্যে আর্ট ও আর্টিস্ট বিষয়ে নানা আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। এখানে কবির সাথে জীবজন্তু প্রেমিক হাডসন, ক্যানিংহাম গ্রেহাম, গিলবার্ট মারে ও লরেন্স বিনিয়নের সাক্ষাৎ ঘটে। পিয়ারসনকে নিয়ে কবি জুন মাসের শেষ দিকে পিটার্সফিল্ডে বেড়াতে যান। পরে রোদেনস্টাইনের একটি পার্টিতে ইয়েটস এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কে লিখিত একটি পত্রে তার

মনোভাব ব্যক্ত করেন। পাঞ্জাবের দুর্ঘটনার পর ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হয়ে উঠেছিল। যা কোন দেশের পক্ষেই মঙ্গলকর নয়। এর পর কবি ব্রিস্টলে যান প্রফেসর লিওনার্দ এর নিমন্ত্রনে। সেখানে Clifton এর বোডিং স্কুলের ছাত্ররা 'রাজা' নাটকের ইংরেজি তর্জমা অভিনয় করে। ব্রিস্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিতে কবি সম্মান জ্ঞাপন করেন। ব্রিস্টলে কবির সাথে আইরিশ নেতা হোরেস প্ল্যাংকোট ও কবি জর্জ রাসেলের পরিচয় হয়।

এরপর কবি ফ্রান্সে যাত্রা করেন। ৬ই আগস্ট ১৯২০, কবি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীতে পৌঁছান। এখানে অ্যালবার্ট কান নামে এক ইহুদীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে অধ্যাপক Le Brur, অধ্যাপক Silva Levy, Noailles, H Bergson প্রমূখ মনীষীদের সাথে কবির আলাপ পরিচয় ঘটে। প্যারিসে কবি 'ফাউষ্ট' নাটকের অভিনয় দর্শন করেন। সেপ্টেম্বরে কবি নেদারল্যান্ডে যান। এখানে ভ্যান ইগেন দের গৃহে প্রায় পক্ষকাল বাস করেন। এরপর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে কবি একটি বক্তৃতা দেন। অপরদিকে ভারতবর্ষে এই সময় গান্ধীজি ও নেহেরু শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজি এই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন। সুদূর ফ্রান্স থেকে কবি একটি পত্র মারফত গান্ধীজীর এই নেতিকর্মের বিচারধারার তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর কবি মার্কিন রাজ্যে পাড়ি দেন। ২৯ শে অক্টোবর তিনি নিউইয়র্কে অবতরণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের যে চিন্তাধারা কবির মনে অনুরণিত হয়েছিল তাই ব্যক্ত করেন ব্রুকলিনের একটি সভায় 'The Metting of The East and The West' প্রবন্ধে। আমেরিকান লীগ অফ পলিটিকাল এডুকেশনে একটি ভাষণ দান করেন। 'Society of Arts and Science' এর তরফে একটি সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। বর্ষশেষে কবি কলিকাতায় ফিরে আসেন।

৩০৩.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড রবীন্দ্রজীবনে এক গভীর অভিঘাত রেখেছে, তাঁর সাহিত্য কর্মেও এবিষয়টি মুদ্রিত—আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্রনাথের স্যার উপাধি প্রত্যাখ্যান ও দেশীয় রাজনৈতিক বর্গের নীরব থাকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৩০৩.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন — ক্ষিতিমোহন সেন।

২। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন — প্রমথনাথ বিশী।

৩। জোড়াসাঁকোর ধারে — অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পর্যায় - ৪
চতুর্থ পর্ব (১৯২১-১৯৪১)
একক - ১৩
লিপিকার রচনাবলী ও সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১৩.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১৩.১ : ভূমিকা

বিশ্বের বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে ১৯২১ সালটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬০ বছর। লেখক তখন বিদেশ ভ্রমণে নিউইয়র্কে ছিলেন। ২ রা জানুয়ারী সেখানে কমিউনিটি ফোরাম এর উদ্যোগে একটি সভায় ভাষণ রাখেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কোথাও তেমন আন্তরিকতা পেলেন না। এরপর ৪ ঠা জানুয়ারী হেলেন কেলারের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হলো। এক অন্ধ, মুক, বধির অথচ প্রতিভাময়ী নারী জীবনের অন্য তাৎপর্য নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের সামনে। এবার ১১ জানুয়ারী এক মহিলা কলেজে ভাষণ দিলেন লেখক এবং ২৫ শে জানুয়ারী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করলেন। নিউইয়র্ক ছাড়বার পূর্বে পোয়েট্রি সোসাইটি থেকে কবির সংবর্ধনার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু এখানে কবির ভাষণে হতাশ্বাস ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে।

এরপর ১লা ফ্রেব্রুয়ারী লেখক শিকাগো যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে শ্রীমতি মুডির বাড়িতে কিছুদিন কাটালেন। মিসেস মুডির প্রতি কবির প্রীতির নিদর্শন রয়ে গেছে- ইংরেজি 'চিত্রা' কাব্যটি তার নামে উৎসর্গিত। শিকাগোতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ খবর পেলেন মেজর পনডতাঁর জন্য এক কিস্তি বক্তৃতার ব্যাবস্থা করতে পেরেছেন। টেক্সাস স্টেটে পনেরোটি বক্তৃতার জন্য পনডসাহেব তাঁকে ঘোরালেন পুলম্যান গাড়িতে। রাতে নিদ্রা ও বিশ্রাম, দিনে বক্তৃতা ও দেখাসাক্ষাৎ চলল।

কবি এলেন আমেরিকায়, কিন্তু কোন দিক দিয়েই কোনো আহ্বান পেলেন না। দু- চার জায়গায় বক্তৃতা করলেন কিন্তু অন্তরের ঠাঁই না মেলায় কবি আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে (২৪ শে মার্চ, ১৯২১) স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভারতীয় ছাত্র সভায় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। কিন্তু আন্তরিকতার

অভাব আবারও বিচলিত করলো তাঁকে। বুঝলেন তাঁর 'স্যর' উপাধি ত্যাগের সংবাদ আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে এসে ইংরেজ ও মার্কিনিদের বেশ আহত করেছে। সপ্তাহ তিন সেখানে থেকে, প্রথমবার বিমান পথে কবি পৌঁছলেন প্যারিসে। এইসময় পত্রবিনিময়ের অন্যতম সঙ্গী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথমবারের মতো পরিচয় হয়। পরিচিত হন অসামান্য ভাবুক ও কর্মী প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে। যাঁর প্রতিষ্ঠিত ম" পলিয়ের বিদ্যায়তনের পৃষ্ঠপোষক হন রবীন্দ্রনাথ। কিছুদিন পর প্যারিসের ম্যুজে গিমে প্রতিষ্ঠান থেকে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হলো। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রাচ্যবন্ধু সমিতি বিশ্বভারতীর জন্য টাকা তুলে অতি দামি দামি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা কিনলেন। এই কাজে শ্রীকালিদাস নাগের ভূমিকা স্মরণীয়।

প্যারিস থেকে কবি চললেন স্টার্সবুর্গ। মহাযুদ্ধের পর ফরাসিরা আলসেস লরেন ফিরে পেয়ে সে দেশে ফরাসিকরণের কাজে লেগেছে। অধ্যাপক লেভি সেখানকার নতুন ইউনিভার্সটির অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন, যাঁর পান্ডিত্যে কবি মুগ্ধ। ফ্রান্স থেকে কবি গেলেন সুইস দেশে (৩০ শে এপ্রিল)। ভ্রমণ করলেন ছোট বড় নানান স্থান। ৬ মে জেনেভাতে পালিত হলো কবির জন্মদিন। লুসারণে এসে খবর পেলেন যে, জার্মানরা কবির জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট জার্মান সাহিত্যের গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিয়েছে, যে সংবাদে কবি আপ্লুত হন।

সুইস দেশ থেকে কবি জার্মানির ডার্মস্টাট ও হামবুর্গ এ পৌঁছলেন। জার্মানির প্রথম ভাষণ তিনি রাখলেন হামবুর্গে (২০ মে)। এরপর এলেন ডেনমার্কে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছে দেখলেন, কবিকে দেখার জন্য এ কী বিরাট জনতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর ছাত্রেরা মশাল জ্বেলে শোভাযাত্রা করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। ২৪ শে মে এলেন সুইডেনে। সেখানে সম্বর্ধনা ভাষণ দিয়ে গেলেন স্টকহোমে, সেখানে বাসকালে লোকসংগীত ও লোকনৃত্য দর্শন করলেন। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় স্বয়ং কবির লেখা নাটক 'ডাকঘর' - যা লেখক নিজে দেখতে যান।

সুইডেন থেকে কবি এলেন জার্মানিতে (২৯শে, মে)। তখন জার্মানি পরাভূত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুটো রাজ্য বিভক্ত হতে পারেনি। বার্লিনে কবি অতিথি হলেন ধনকুবের স্টাইনাসের গৃহে, যা নিয়ে বেশ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। ২৩শে জুন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দিন যে ভিড় হয় তা বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক সমাগম ঘটে সেখানে। একদিনে তাই রেহাই পাননি কবি, দ্বিতীয় দিনেও তাঁকে বক্তৃতা করতে হয়। "প্রুশিয়ান একাডেমি", যেটি জার্মানির নাম করা বিদ্ধতসমাজ, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও একদিন বক্তৃতা দিলেন। তারপর সেখানকার কর্তৃপক্ষ কবির বাংলা ও ইংরেজি কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে রাখলেন।

বার্লিন থেকে মিউনিখে এসে কয়দিন থাকলেন ও সেখান থেকে গেলেন ডার্মস্টাটে। সেখানে মনীষী কাইসারলিঙ - এর সাথে সাক্ষাৎ হয় কবির। ডার্মস্টাটে কবি যে সপ্তাহটি ছিলেন তার নামকরণ হয় 'Tegore Woch', যার অর্থ 'ঠাকুর সপ্তাহ'। চারদিক থেকে লোক এসে কবিকে প্রশ্ন করতেন, কবি দোভাষী দ্বারা বৈকালিক সভায় তা বুঝিয়ে দিতেন। একদিন ডার্মস্টাট শিল্পকেন্দ্রের আড্ডায় কবি গেলেন। নিজ বক্তৃতার দ্বারা এইসমস্ত লোকেদের মনে ভাবান্তর আনলেন কবি, এ যেন তাঁর জীবনে এক বিজয় স্বরূপ।

কবির মন দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা থেকে আসা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সেখানে Winternitz G Lesney-র সহিত পরিচয় হলো, যাঁরা উভয়েই হলেন রবীন্দ্রভক্ত ও প্রাচ্যবিদ্যার পন্ডিত। কবিকে প্রাগ নগরীতে যেতে হলো তাঁদেরই আহ্বানে। এরপর স্টুটগার্ট ও প্যারিস যাত্রা করে অবশেষে দেশে ফেরার উদ্যোগ করলেন কবি। দেশের পত্র বিচলিত করছে তাঁকে। দেশে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে, কবির দেশত্যাগের কিছুকাল পরেই। শান্তিনিকেতনেও রাজনীতির উত্তেজনা অনেকাংশেই স্পর্শ করেছে। ১৯২১ সালের ১৬ ই জুলাই কবি ভারতে ফিরে এলেন।

শান্তিনিকেতনকে সর্বমানবের মিলনতীর্থ করবেন, এই কল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলের পরিহাস সেই চিন্তনের বাধাস্বরূপ। নিজের ভাবনা ও জাতির চিন্তার আকাশকে কুয়াশামুক্ত করতে করতে ১৫ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন — 'শিক্ষার মিলন'। তবে মানুষের সমর্থন তখন গান্ধীজির দিকে। কবি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ লিখে কলকাতায় এসে পড়লেন। গান্ধীজির মহত্ব স্বীকার করেও কবি তাঁর মত ও পথ মেনে নিতে পারলেন না। 'Young India' পত্রিকায় গান্ধীজি 'The great sentinel'- লিখে কবিকে জবাব দিলেন।

রাজনীতির সীমিত উত্তেজনা থেকে সরে এলেন কবি। আবারও সুরের রাজ্যে পদার্পন করতে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব করালেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে (২-৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২১)। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জলসা, তৎকালীন পরিস্থিতে যা লোকনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির ৬০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিনি শান্তিনিকেতনে পদার্পন করলেন। পূজাবকাশের পূর্বে 'ঋণশোধ' নাটক অভিনীত হলো, যা শারোদোৎসবেরই পরিবর্তিত রূপ। পূজার ছুটির সময় শান্তিনিকেতনে এলেন পিয়ারসন, আর এলেন লেনার্ড এল্‌মহারস্ট। যাঁর সঙ্গে আমেরিকায় কবির দেখা হয়েছিল। তিনি মূলত কবির গ্রামদ্যোগ পরিকল্পনার ভার নেবেন বলে এসেছিলেন। এবার সস্ত্রীক ফ্রান্স থেকে এলেন অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি (নভেম্বর, ১৯২১)। তিনি আসায় বিদ্যাভবনের কাজ নূতন পথ নিল। বিশ্বভারতীতে শুরু হলো চিনাভাষা, সাহিত্য, তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের চর্চা। কবিমন ছাড়া পেল কাব্যরচনার মধ্যে। সে কাব্য "শিশু ভোলানাথের" মাধুর্য্যবাণী। রবীন্দ্রনাথ নিলেন "বলাকা" কাব্যের ক্লাস। এবার পৌষ উৎসবে (৮ ই পৌষ ১৩২৮: ২৩ ডিসেম্বর) কবি বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিলেন। সভাপতি হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। একখানি সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

"শান্তিনিকেতনে নতুন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হলো, এখানে আমাদের নবযুগের অথিতিশালা খুলেছে।"

২৮শে ডিসেম্বর কবি রওনা দেন শিলাইদহে, পদ্মাতীরের নিরবতায়। ১৯২২ সাল। কবির বয়স ৬১ বছর। কবি পদ্মাতীরের নির্জনতা উপভোগ করে ৫ ই জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। অসম্পূর্ণ 'মুক্তধারা' নাটকটি এইসময় শেষ করলেন। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের হিংসাবৃত্তির আগুন দেশময় ছড়িয়েছে। কবি আশঙ্কিত হলেন, সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় (৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারী) সতর্কবাণীপূর্ণ একটি পত্র রচনা করলেন। যে আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হলো ৩রা ফ্রেব্রুয়ারী 'চৌরিচৌরা' ঘটনার মধ্যে দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতন 'Rural Reconstruction' বা পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক এল. কে এলমহার্স। প্রতিষ্ঠানের ব্যায় বাবদ অর্থ আসে আমেরিকা থেকে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী মলিয়ারের ত্রিশত বার্ষিকী উৎসবে শান্তিনিকেতনে কবি একটি ভাষণ প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে চৌরিচৌরার ঘটনায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেশময় এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ই মার্চ গান্ধীজির ছয় বছরের কারাদন্ড হয়। দিন যায় কখনো শান্তিনিকেতন, কলকাতা অথবা শিলাইদহে। চলছে নতুন রচনা। ১৯২২ সালেই প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'। বাংলাসাহিত্যের গল্পের ধারাবদলে 'লিপিকা' এক মাইলফলক। এই 'কথিকা' গুলি লেখার সময় তিনি নানা কারণে কিছুটা অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে চেয়েও কাউকে পাশে পাচ্ছিলেন না। একলাই চলতে হয়েছিল তাঁকে। অবলীলায় ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজদের দেওয়া 'নাইটহুড'। এমনই মানসিক টানাপোড়েনের সঙ্গে জুড়ে ছিল তাঁর কবিমন আর কর্মীমনের এক চিরকালীন দ্বন্দ্ব। একটি চিঠিতে

রথীন্দ্রনাথকে তিনি বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কাজের জন্য একটা অন্য জীবন চেয়েছিলেন কবি। যাপিত জীবন যেন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছিল না। এ দ্বন্দ্ব তাঁর মননে চিরস্থায়ী হয়েছিল।

'ভুল স্বর্গ' লিপিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প। এই গল্পের ভাব অনেকটাই আমরা খুঁজে পাই তাঁর 'চিত্রা'-র 'আবেদন' কবিতায় ভৃত্য যেখানে রানীকে বলেছেন 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'। গল্পটি পড়তে পড়তেই এর অন্তরে আত্মগোপন করে থাকা কবিতার বীজটিকে আমরা চিনে নিতে পারি। মালাকর যেন ''ভুল স্বর্গে''র সেই বেকার লোকটি, যে ভুলবশত এসে পড়েছে এক 'কেজো লোকের স্বর্গে'। যেখানে আর সবই আছে, নেই কেবল অবসর। অবকাশ নেই কারও পৃথিবীর অমেয় রং-রূপে ভাগ নেওয়ার। গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা খোঁজ পাই সেই কলসটির। এই 'ঘট' বা 'ঘড়া' কিংবা রবীন্দ্রনাথের বহুব্যবহৃত খুব প্রিয় একটি রূপকল্প। সমস্ত প্রয়োজনের বন্ধনকে সম্পূর্ণভাবে অভিনব করে তোলা এক বিশুদ্ধ শিল্প চৈতন্যের অনন্য রূপক। এই কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে কিটসের 'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন' কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এভাবেই জীবনের নানান ছোট খাটো অথচ গুরুগম্ভীর বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ লিপিকায় ব্যাক্ত করেছেন। আর আমাদের উপহার দিয়েছেন জীবনের মর্মকথা।

এপ্রিল মাসে শান্তিনিতনে ফিরে বর্ষশেষ ও নববর্ষ মন্দিরে উপাসনা করলেন কবি। এরইমধ্যে ২৬ শে মে বিশ্বভারতী সোসাইটি রেজিস্টার্ড হলো। আর জুলাই মাসে শেলীর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে ভাষণদান করলেন। ২৮ শে জুলাই কলকাতা আগমন করলেন এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিসভায় নিজ কবিতা পাঠ করলেন। ২৮ শে জুলাই কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা হয় ও এলমহার্স্টের ভাষণ 'The Robbery of Soil' পাঠ করেন। এছাড়াও বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সভায় কবি ভাষণ দেন।

এবার শান্তিনিকেতন ফিরলেন কবি। ২২ শে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ই আগস্ট বিশ্বভারতীর নিজস্ব সংবিধান রচিত হওয়ার পর কবি পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৩২৯ ভাদ্র মাসে দ্বিতীয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়, প্রথম রামমোহন লাইব্রেরী হলে, তারপর এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র - ছাত্রীদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম গীতাভিনয়। তখনও এই বিষয়টি তেমন ভাবে সমাজে প্রচলিত হয়নি - জলসায় টিকিট কেটে লোক আসে, বিশ্বভারতীর অর্থের চাহিদা কিছুটা মেটে। ২১ শে আগস্ট প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র সম্মেলনে কবি ভাষণ রাখেন। তারপর আগস্টের শেষে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ও 'ভানুসিংহের পদাবলীর' বেশকিছু কবিতা তিনি এইসময় রচনা করলেন। সঙ্গে চলছে 'শারদোৎসব' মহড়া।

আবার ফিরে এলেন কলকাতায়, সেখানে রঙ্গমঞ্চে 'শারদোৎসবের' অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তবে কালের অমোঘ নিয়মে ১৮ই সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে ৬০ বছর বয়সে মারা যান দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদিকে বিশ্বভারতীর ব্যয় বেড়ে চলেছে, টাকার যোগান দিতে তাই রবীন্দ্রনাথ চললেন সফরে। ২০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই-পুনা হয়ে তিনি গেলেন মহীশূরে। তখন সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন। তাঁর অতিথি হয়ে সেখানে দুই দিন ব্যাপী বক্তৃতা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, ম্যাঙ্গালোর হয়ে সিংহল পৌঁছলেন ১১ই অক্টোবর। সেখানে পৌঁছে কলম্বোতে ডি. সিলভারের অতিথি হলেন। সেখানকার ট্রেনিং কলেজে এবং ১৩ই অক্টোবর Y.M.C.A হলে বক্তৃতা দিলেন। সেখান থেকে ১৫ই অক্টোবর পৌঁছলেন গ্যালেতে অলকট হলে। সেখান থেকে Winternitz ও চেক অধ্যাপক লেসলির আশ্রমে এলেন। ৯ই নভেম্বর সিংহল থেকে

কেরল দেশের তিরুবনন্তপুরম নগরে এলেন। সেখানে থিয়া জাতির গুরু নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অবশেষে কুইলন, এরনাকুলাম, আলেপ্পো, কোচিন, আলওয়ে ও তাতপুরম হয়ে মাদ্রাজে পৌঁছলেন ১৯শে নভেম্বর। তবে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল ভ্রমণে অভ্যর্থনা পেলেও অর্থাগম হয়েছিল খুবই কম। যা পেয়েছিলেন তা বক্তৃতার টিকিটবেচা টাকা মাত্র। তাই কবি লিখেছিলেন -

"আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হাতে নিয়ে বললে ঠিক হয়না, কণ্ঠে নিয়ে।" (রবীন্দ্রজীবনকথা- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

২৩শে নভেম্বর মাদ্রাজ থেকে ফিরে এলেন বোম্বাই। সপ্তাহ খানেক ছিলেন সেখানে। দেখা করলেন পার্শি সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয়দের সাথে। বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য কবি ব্যক্ত করলেন তাদের কাছে। তারা দুহাত ভরে অর্থ দিলেন। বোম্বাই থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর এলেন আমেদাবাদে, আম্বালাল সারাভাইদের বাড়ি, গেলেন সাবরমতি আশ্রমে। গান্ধীজির দেখা পেলেন না। অবশেষে পৌষ উৎসবের পূর্বে কবি তাঁর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত সফর শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন (ডিসেম্বর, ১৯২২)। পৌষ উৎসবে ও খ্রিস্ট উৎসবে কবি ভাষণ দান করলেন।

৩০৩.৩.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। লিপিকার রচনাবলীর মধ্যে সূচীপত্রে তিনটে বিভাজন আছে, এই বিভাজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। লিপিকার কোনো কোনো রচনায় গদ্য কবিতার সার্থক নিদর্শন পরিস্ফুট—উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। 'তোতাকাহিনী' রচনায় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা লেখ।

৩০৩.৩.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

২। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

একক - ১৪

পূরবী কাব্যের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনায় (১৯২৪) অবস্থানকালে সাহিত্য-শিল্পকলা বিষয়ক বিভিন্ন চিন্তাভাবনা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১৪.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১৪.১ : ভূমিকা

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ১৮ই অক্টোবর ১৯২৪ সালে প্যারিস থেকে এলমহার্সকে সঙ্গে নিয়ে শেরবুর্গ বন্দর থেকে আন্ডেজ জাহাজে করে আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি সেই সুদূর পাশ্চাত্যের দেশ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় গিয়ে লেখা। যাতে সে দেশের কথা, আমাদের দেশের কথা ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা রয়েছে। প্রভাত কুমার লিখেছেন-

"শেরবুর্গ হইতে আর্জেন্টাইনের রাজধানী বুয়েনাস এয়ারিস তিন সপ্তাহের পথ। এই দীর্ঘকাল জাহাজের অনুকূল পরিবেশে বদ্ধ ক্যাবিনের মধ্যে বাস কবির মন ও শরীরের পক্ষে ভালো হয় নাই। তবে কাব্য লক্ষ্মী দেখা দিলেন এই কয়দিনে ২৩ টি কবিতা (পূরবী) লেখেন...।" (রবীন্দ্র জীবনী-৩, পৃষ্ঠা:২১৫)

জাহাজের মধ্যে বসে তিনি কবিতাগুলি লিখতে শুরু করলেন। আনমনা মনে নিজ খেয়ালে লিখলেন -

"আনমনা গো, আনমনা,

তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।" (আনমনা)

এইভাবে 'পূরবী' কাব্যের কবিতাগুলি একে একে লেখা শুরু করলেন। যা পরে একত্র করে 'পূরবী' নামে প্রকাশ হয়। এর কবিতাগুলি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল।

আর্জেন্টিনার বুয়েনাস এয়ারিস থেকে ২০ মাইল দূরে San I sidore নামক শহরের উদ্যান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ রইলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারনে সমস্ত কাজ বন্ধ করে নির্জন প্রান্তরে একা নিরিবিলিতে সময় কাটাতে লাগলেন। এরপর পেরু যাওয়ার কথা ছিল। যা পেরুর স্বাধীনতা উৎসব পালনের দিন। কিন্তু ব্রিটিশ

রাষ্ট্রদূতের ভুল ব্যাখ্যায় সেখানে আর যাওয়া হয়নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের এইবারই শেষ যাওয়া। তবে লা প্লাটা নদীর তীরে পাটাসোনিয়ার তৃণপ্রান্তর ও আমাজন অববাহিকার অরণ্যে তিনি বিচরণ করেছিলেন। এখানে কবিকে রাজ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। সকলেই কবিকে দেখে খুবই আপ্লুত হয়েছিলেন। বুয়েনাসে দুই মাস থাকাকালীন সময়ে 'পূরবী' কাব্যের ছাব্বিশটি কবিতা লিখেছিলেন। প্লাজা হোটেলে থাকার সময় ভিক্টোরিয়া ওকম্পোর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সিরালরিও থাকার সময় ওকাম্পো কবিকে অনেক সেবাযত্ন করেছিলেন। সেই কারনে মুগ্ধ কবি 'বিজয়ার করকমলে' 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করলেন। তাই 'অতিথি' কবিতায় লিখলেন-

"প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী

মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি

দূরদেশী পথিকেরে...।" (অতিথি)

নতুন পরিবেশে কবির লেখনীতে যৌবনের জোয়ার সংগীত অকস্মাৎ দেখা দিল। কয়েকদিন পূর্বে আশা করেছিলেন 'ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা'। আজ সেই ক্লান্ত দেহ মন নারীর স্নেহসিক্ত সেবায় যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলো।

কবি এদেশে ছাড়বার তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। ২৪শে অক্টোবর অর্ডিন্যান্স জারি হয়। চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বরাজ দল প্রবল হয়। এইসব খবর পেয়ে দিনেন্দ্রনাথকে ২০ ডিসেম্বর একটি কবিতা পত্র পাঠান, যা এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আর্জেন্টিনায় ৩০শে ডিসেম্বর রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট আলবিয়ার এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করে খুবই প্রশংসা করেন। অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণেই হোক পেরু যেতে না পারায় রবীন্দ্রনাথ তার জন্য ব্যয়িত অর্থ স্টেটকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পেরু সরকার তা গ্রহণ করেননি। এর থেকেই বোঝা যায় তারা রবীন্দ্রনাথকে কতটা ভালোবাসতেন। তাইতো কবি লিখেছেন-

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান

দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান..." (কঙ্কাল)

এরপরে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকার সকলের মনকে জয় করতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় গিয়ে সেদেশের মানুষের সাথে একাত্মতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ খুবই আপ্লুত ছিলেন। বিশেষত সে দেশের প্রশংসা ও ওকাম্পোর কথা তিনি চিরকাল মনে রেখেছেন। যা সম্পর্কে প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থে আছে -

"যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।...স্প্যানিসরা ভাবপ্রবণজাত, সামলানো বড় কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যেই দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।" (নির্বাণ)

এখানে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ, ওকাম্পো, এলমহার্স ও সেই দেশীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাহিত্য সমাজ বিষয়ক আলোচনা করে ছিলেন, যাতে ওকাম্পো সবসময় সাথে থাকতেন। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখনই যে দেশে ভ্রমণে গেছেন, তখনই সেদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্রনীতির সার্বিক পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন অসঙ্গতি দেখলে প্রতিবাদও করেছেন। যেমন ব্রিটিশ ও আমেরিকার সরকারের অনেক নীতিকে তিনি সমর্থন করেননি। এদেশে ভ্রমণকালে তিনি 'পূরবী'র কবিতাগুলি লিখেছেন, যেখানে কবিহৃদয়ের স্নেহ- ভালবাসা ও সৌন্দর্যবোধের দীপ্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৩০৩.৩.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। পূরবী কাব্যে রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখ।

২। কবির আর্জেন্টিনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও সেই জীবনাভিজ্ঞতা কিভাবে কবির কাব্যচেতনায় প্রতিফলিত—আলোচনা করো।

৩। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সান্নিধ্য ও রবীন্দ্র চিত্রকলার বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩০৩.৩.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

২। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

একক - ১৫
বিশ্বসভায় বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১৫.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১৫.১ : ভূমিকা

উত্তর:বিশ্বসত্তার সাথে ব্যক্তিসত্তার মিলন আড়ালে আবডালে কখনো সম্ভব নয়, অনেক কাছ থেকে পরখ করে না দেখলে সে সংযোগ সম্ভবপর নয়। আর একারণে তার আহ্বান বার বার আমাদের কাছে আসে। তাকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সেই ভ্রমণ কখনো অকারণে হয়নি। উনি যে দেশে গেছে সেই দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অঙ্কিত করে এসেছেন, যা তাকে অনেক পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এই সব দেশের ভ্রমণকালের কথা তিনি বিভিন্ন ডায়েরি, প্রবন্ধ তুলে ধরেছেন।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র:

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৭ বছর তখন পড়াশোনায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ তেমন না থাকার জন্য গুরুজনরা অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ভদ্রঘরের সন্তান রবীন্দ্রনাথ এই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ না থাকার জন্য তাঁকে ১৮৭৮ সালে প্রথম ইংল্যান্ডে যাত্রা করতে হয়। সেই ইংল্যান্ডে যাত্রা কালে তিনি সেখানে দুই বছরব্যাপী বসবাসের যাবতীয় বৃত্তান্ত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮) প্রবন্ধগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইউরোপ যাত্রার ধারাবাহিক বিবরণ(১৮৭৮-১৮৮০) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১২৮৮ সালে সমগ্র পত্রগুলিকে একত্রীকরণ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়।

সেকালে ইউরোপ যাত্রা জন্য সরাসরি এখনকার মতো যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য জাহাজের মাধ্যমে জলপথে ইউরোপে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে পৌঁছতে হয়েছিল। সেই যাত্রাপথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম পত্র থেকেই

আলোচনা শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পুনা থেকে ২০ই সেপ্টেম্বর পাঁচটার সময় জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে সমস্ত ভারতবর্ষের তটরেখা যেন মিলিয়ে গেল। জাহাজে থাকাকালীন তিনি আর সেই কোলাহল সইতে না পেরে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। প্রিয় মাতৃভূমি থেকে ক্রমশ বিচ্ছেদের কারণে তার মন যেন অবসন্ন, নিঃস্ব, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। এই সময় ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানান সামুদ্রিক পীড়ার মধ্যে তিনি পড়েছিলেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। জাহাজের সেই ছোট্ট ঘরে তিনি ছয় দিন মশার উপদ্রবে কাটিয়েছিলেন।

"যে ঘরে থাকতেম, সে অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতর আসে তাই তার চারদিকের জানালা সম্পন্ন রূপে বন্ধ। অসূর্যস্পর্শরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র।" (প্রথম পত্র, পৃ: ১১)

জাহাজযাত্রা অত্যন্ত শারীরিক পীড়াদায়ক হওয়ায় কেবিনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের বারবার মাথা ঘুরে আসছিল এবং তার বমি বমি ভাব পাচ্ছিল। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি তার নিজস্ব ঘরের মধ্যেই থেকেছেন। এইভাবে ৬ দিন পর পুনা থেকে যাত্রা করার পরে এডেনের পৌছান।

এডেন থেকে সুয়েজ যেতে রবীন্দ্রনাথের প্রায় পাঁচ দিনের মতো লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসির পথ দিয়ে ইংল্যান্ডে যায় তারা জাহাজ থেকে নেমে সুয়েজ রেলওয়ে গাড়িতে উঠে আলেকসান্দ্রিয়াতে যেতে হয়। আলেকসান্দ্রিয়া বন্দরে তাদের জন্য একটা স্টিমার অপেক্ষা করে, সেই স্টিমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইতালিতে পৌঁছায়। সেখান থেকে ইউরোপে পৌঁছানো যায়। রবীন্দ্রনাথরা তিনজন বাঙালি এবং একজন ইংরেজ মিলে একটি নৌকা ভাড়া করল। আরব থেকে যার মাঝি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন, অনেকটা পশুদের মত দেখতে, কুচকুচে কালো, কপাল উঁচু, ঠোঁট পুরু, সত্য অতি ভয়ানক দেখতে। এরা আরব জাতি, এদের বিশ্বাস করা খুবই দুর্ভোগ ব্যাপার। কিন্তু দুই সিলিং ভাড়া দিয়ে সুয়েজে নৌকায় চাপেন রবীন্দ্রনাথ অন্যান্যরা। রবীন্দ্রনাথের সুয়েজকে সম্পর্কে কিছু বলার নেই, কারণ সুয়েজ আটমাইল এর বেশি রবীন্দ্রনাথ দেখতে পাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল সুয়েজকে দেখবার, তার সহযাত্রীরা সুয়েজ সম্পর্কে এমন কিছু বললেন যাতে তাঁর আর উৎসাহ রইল না। সুয়েজ থেকে আলেকসান্দ্রিয়াতে পৌছান। আলেকসান্দ্রিয়া বন্দরে রবীন্দ্রনাথের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টিমার অপেক্ষা করছিল। এই স্টিমার করে রবীন্দ্রনাথরা ভূমধ্যসাগর আহরণ করবেন। এখানে একটু একটু ঠান্ডা লাগছিল। রবীন্দ্রনাথ এখানে স্টিমারে উঠে স্নান করলেন। এবং সমগ্র আলেকসান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেন। এখানকার একেকজন মাঝি স্যার উইলিয়ামের জোনসের দ্বিতীয় সংস্করণ। তারা গ্রীক-ইতালি-ফ্রেঞ্চ-ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে আলেকসান্দ্রিয়ার সাধারণ ভাষা হল ফ্রেঞ্চ। রাস্তাঘাট, সাইনবোর্ড, দোকানগুলোর আত্মপরিচয় অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকসান্দ্রিয়া শহরটি রবীন্দ্রনাথের কাছে সমৃদ্ধশালী মনে হলো। এরপর স্টিমারে করে ৪-৫ দিন যাত্রার পর ইতালিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলেন তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। অবশেষে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হলো রবীন্দ্রনাথকে। এখানেই প্রথম ইউরোপের মাটিতে রবীন্দ্রনাথের পা পড়ল। ইতালি থেকে

ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা নির্ঝর নদীর পথ, গ্রাম দেখতে দেখতে পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিল, অবশেষে সকালবেলায় প্যারিসে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথ। প্যারিসে এক্সিবিশনের বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তাঁর জ্যোতিদাকে। তবে কলকাতার ইউনিভার্সিটি মতো প্যারিসের এক্সিবিশনের যা দেখেছেন তা কিন্তু ভালো করে দেখেননি। একদিনের বেশি রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে থাকতে পারেননি। কারণ প্যারিসের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড একদিনে দেখা সম্ভব নয়। তারপর প্যারিস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লন্ডনে যাত্রা করলেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে সুয়েজ খাল থেকে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইটালি হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছলেন।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'এ প্রথম পত্রে তিনি জাহাজ যেতে যেতে কিরূপ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার কথা রয়েছে। তার সাথে তিনি বিদেশী নারীদের প্রসঙ্গও এনেছেন। তিনি বলেছেন তিনি জাহাজে যে সকল 'লেডি' ছিল তাদের থেকে দূরে থাকতেন। জাহাজে যে সকল নারীরা ছিল তাদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই ছিলেন বয়স্কা। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদাকে বলেছেন-

"পুরুষদের মন লুটপাট করবার জন্য এই দিদিমার বয়সী লেডিগন যেরকম প্রাণপণে যত্ন করতেন তা দখলে তোমার মায়া হত।" (প্রথম পত্র)

কিন্তু অল্প বয়স্কা মেয়েটি ছিল গম্ভীর প্রকৃতির। সে পুরুষদের থেকে সবসময় দূরে থাকতো। ইটালিতে পৌঁছে কবি ইটালির মেয়েদের দেখেছেন, তাদের দেখে তিনি প্রশংসা করেছেন। ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রঙ, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ আর মুখের গড়ন চমৎকার। তবে তিনি রাস্তায় কেবল ছোটলোকদের মেয়েদের দেখেছেন। কিন্তু তাদেরও দেখে তার খুব ভালো লেগেছে।

ইংল্যান্ডের মেয়েরা বেশভূসায় লিপ্ত, পুরুষরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে অন্যান্য জায়গায় তেমনি চলছে। এখানকার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে- তুমি নাচে গিয়েছিলে কিনা, কনসার্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নতুন এক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি। এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোহায়, সোফার ফ্যাশন দিয়ে নোভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং আবশ্যক অনাবশ্যকভাবে যুবকদের সঙ্গে ফ্ল্যাট করে। উভয় দেশের মেয়েদের তুলনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন-

"এ-বিষয়ে একটা দেশি পুতুল ও একটি বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি।" (সপ্তম পত্র, পৃ:৪৯)

এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক, টেম্পারেন্সিং মিটিং, ওয়ার্কিং সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল এর মধ্যে তারা তাল মিলিয়ে চলছে। মেয়েদের ছেলেপিলে আছে তারা তাদের মানুষ করে। এইভাবেই নারীর এখানে জীবনযাপন করে। ভারতীয় নারীদের থেকে ইউরোপের নারীদের জীবনযাপনের বৈচিত্র্য অনেক ভিন্নধর্মী।

যুরোপ যাত্রীর ডায়রি:

১৮৯০ সালের রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বারের জন্য বিলেতে যাত্রা করলেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সাথে লোকেন পালিতকে নিয়ে তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু সাহিত্যরসজ্ঞ সমালোচক। বোম্বাই বন্দর থেকে শ্যাম নামক জাহাজে তারা রওনা হলেন। সূর্যাস্তে জাহাজের ছাদের উপরে হালের কাছে দাঁড়িয়ে কবি ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলেন, এরই মধ্য দিয়ে জাহাজ যেন এগিয়ে চলল। তবে জাহাজের সি-সিকনেস প্রভৃতিতে যে কষ্ট কবি পেয়েছেন তার বিচিত্র বিবরণ তিনি ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরির বিভিন্ন অধ্যায়। ২৯ শে আগস্ট রাতে কবি এডেন বন্দরে পৌঁছলেন, এর পূর্বেও তিনি এডেন বন্দরে এসেছিলেন। যার বিবরণ 'যুরোপ প্রবাসীর পত্রে' রয়েছে। যেখান থেকে কবি পরের দিন জাহাজ বদল করলেন পাহাড় পর্বতের চূড়া জ্যোৎস্নাময় রাত্রি এবং বন্ধুর লোকেনপালিতের সাথে মধুর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে।ম্যাসীলিয়া নামক জাহাজে করে তারা ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এরপর ৩রা সেপ্টেম্বর বেলা দশটার সময় সুয়েজ খালের প্রবেশ মুখে সেই জাহাজ এসে থামল, চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা কবিকে মুগ্ধ করল। খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ, নৌকা সমস্ত দিন অতি ধীরে ধীরে চলছে। দু"ধারে রয়েছে তরুহীন বালুকাতীর, অনেক রাত্রে আধখানা চাঁদ উঠল। রাত দুটো তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট মেলেদে নোঙর করল। ভূমধ্যসাগরে পৌঁছল ৪ঠা সেপ্টেম্বর। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে কবিরা ব্রিন্দিসে পৌঁছান। রেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, কবিরা গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি যখন ছাড়লো তখন বৃষ্টি টিপটিপ করে শুরু হলো, আহার সম্পন্ন করে এসে কবিরা গাড়ির এক কোণের জানালার পাশে বসলেন। প্রথমে দুই ধারে কেবল আঙ্গুরের ক্ষেত, তারপর জলপাইয়ের বাগান, তারপর বামে চাষের মাঠ, সাদা সাদা ভাঙাভাঙা পাথরের টুকরো কবির মন এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যেন মিলিয়ে যেতে লাগলো।কবি এইসব বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে অবশেষে কবি প্যারিসে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর কবিরা লন্ডনে পৌঁছান।

এই লন্ডনে পৌঁছেই কবি যেন তার কৈশোরের পরিচিত লন্ডনকে খুঁজতে গেলেন, "খুঁজিতে গেছিল কবে মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে"। তিনি পূর্বে লন্ডনে এসে স্কটের যে পরিবারে থাকতেন, সেই বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সেখানে অন্য ভাড়াটিয়া থাকেন। পুরাতনের স্মৃতি কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে তার অন্তরে বাস করছিল, কিন্তু বাইরের জগতে আছে যেমন পরিবর্তন অন্তরের জগত পরিবর্তন কম হয়নি। কবির সেই দীর্ঘ ১২ বছরের ব্যবধানকে বিস্তৃত হয়ে তাঁর প্রথম জীবনের রঙিন দিকগুলিকে খুঁজতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে ইংরেজি পোশাক পড়েন নি, অর্থাৎ কলার নিকটাই টুপি ব্যবহার করেননি, গলাবন্ধ কোট ও মাথায় টুপি পড়লেন, তার ওপর সামান্য লম্বা চুল ও অল্প অল্প দাঁড়ি, সমস্ত মিলে লন্ডনবাসী আধুনিকদের কাছে এক অদ্ভুত মনে হতো কবিকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব পোশাক ত্যাগ করে কোনদিনই বিদেশী পোশাক পরেননি। ইংল্যান্ডের ঐশ্বর্য ও বিলাস দেখে রবীন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ, তেমনি ওই সকল রাজসিকতার সাথে যে গভীর দুঃখ চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্যতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যেতে পারেনি।

"ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে- 'song of shirt' শিট পড়লে তা টের পাওয়া যায়। এই সুখ সমৃদ্ধির অন্তরালে কি অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছেসেটা আমাদের চোখে পড়ে নাকিন্তু

প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।"(যুরোপ যাত্রীর ডায়রি)

এখানে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ২৭ সেপ্টেম্বর লাইসিয়াম নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত স্কট রচিত 'ব্রাইট অফ ল্যামারমুর' উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় দেখতে যান। উক্ত উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ে কবি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন, তবে প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এখানে তাঁর একটুও ভালো লাগেনি। এটা তাঁর লজ্জা নয়, হয়তো তাঁর স্বভাবের দুটির কারণেই। অতএব তিনি বাড়ি ফিরবেন বলে স্থির করেছে। এইভাবে তিনি ইংল্যান্ড থেকে এক পারসী সহযাত্রীর সাথে করে জাহাজ পথেই তিনি ৪ঠা নভেম্বর ভারতবর্ষে কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথযুরোপ যাত্রীর ডায়রি সেই দেশের সার্বিক সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির, মানুষের জীবনযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন এবং সমগ্র যাত্রা পথের নিখুঁত বিশ্লেষণ করে তুলেছে। ওই বছরই তিনি লিখেছেন 'বিসর্জন' নাটকটি,'মন্ত্রী অভিষেক' নামে প্রবন্ধটি এবং 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন।

জাপান যাত্রী:

১৯১৬ সালে প্রথমবারের জন্য জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য জগত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার নোবেল পেলেন। এই সময়ে কবির খ্যাতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। যার ফলে চিন্তাবিদ দার্শনিক প্রবন্ধকার নাট্যকার কথা সাহিত্যিক গল্পকার প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের নামচারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ, রাজ্য থেকে বিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় এবং সে দেশে ভ্রমণের আমন্ত্রণ করে। কবি প্রথমদিককার যাত্রা ছিল গুরুজনদের কথা মেনে নিয়ে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিদেশ যাত্রা।তবে এবারে উদ্দেশ্য অন্য। জাপান যাত্রা উপলক্ষে বাড়ির লোকেরা সকলেই কবিকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বন্ধুরা ফুলের মালা দিয়ে কবিকে বিদায় দিলেন বটে তবে জাহাজ আর চলল না। কারণ কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত গিয়ে বসে থাকতে হয়। তাই কবি রসিকতা করে বলেছেন- "যারা থাকবার তারাই গেল আর যেটা চলবার সেটা স্থির হয়ে রইল দাঁড়িয়ে"। জাপান যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথের জাহাজের ডেকের উপর শোওয়ার ব্যবস্থা হল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের জাহাজে চলার বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে। জাহাজের লোকজন কর্মচারী ক্যাপ্টেন প্রমুখ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ কখনো তৃপ্তি বা বিতৃষ্ণা ভরে তুলেছে। এবার ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখে কবির ভালো লোক বলে বোধ হয়, কবি যেন এর নিকট অনুরোধ করে যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল নিয়মের বিন্দুমাত্র নড়চড় হবার জোর নেই। ক্যাপ্টেন এর কাছে কবি সহযাত্রী ইংরেজি বন্ধু ডেকের উপরে তার কেবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছায় তা সম্ভব হয়ে উঠল না। ২৪ শে বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বৃহস্পতিবার বিকেলে জাহাজ সমুদ্রের পাইলট নেমে গেল। এর কিছু সময় আগে থাকতে সমুদ্রের রোগ কবি নিকট দেখা দিতে শুরু করেছে 'তার কুলের বেরি খসে গেছে' কিন্তু এখনো তার মাটির রঙ ঘোরে নি, জাহাজের নিচের তলায় কতগুলি প্যাসেঞ্জার ছিলেন তাদের বেশিরভাগই সবাই মাদ্রাজি, তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন আছেন মুসলমান। এই জাপান যাত্রাকালে সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে ঝড়ের মধ্যে জাপানি মোল্লারা ছোটাছুটি

করছিল, কিন্তু তাদের মুখে হাসি ক্রমশই ফুটেছিল তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র।

২৪ শে বৈশাখ অপরাহ্নে জাহাজ রেঙ্গুনি এসে পৌঁছালো, তবে রেঙ্গুনে পৌঁছে কবি রেঙ্গুন শহরের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাননি। কবি মনে হয়েছে এই শহরটা দেশের মাটি থেকে একেবারে গাছ হয়ে ওঠেনি, শহরটা যেন কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসে চলেছে। সুতরাং শহরটির যেন স্থান বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। দিল্লি আগ্রা কাশী প্রভৃতি শহরগুলি যেমন মানুষের আনন্দের ফলশ্রুতি স্বরূপ গড়ে উঠেছে, এই শহরটি যেন সেরকম নয়। এরপর ২৯ শে বৈশাখ বিকেলের দিকে তো তোসামারু জাহাজ পিনান বন্দরে এসে পৌঁছল। কবির মুহূর্তে মনে হল পৃথিবীটা যেন বড় সুন্দর, জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখতে পেলেন। ধরণী যেন দুই বাহু মিলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে, মেঘের ভিতর দিয়ে নীলের আবহাওয়া মুক্ত পাহাড়গুলির উপরে একটি সুখময় আলো করছে, সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালী রঙের ওড়নার মত দেখাচ্ছে।

পিনাঙবন্দরে মালপত্র বেশি না থাকাতে পরের দিন সন্ধ্যায় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করল। পরবর্তী বন্দর সিঙ্গাপুর জাহাজ ভিড়ল। পিয়ারসন ও মুকুল সিঙ্গাপুর দেখতে বের হলেন। এন্ড্রুজ ও কবি জাহাজে থেকে গেলেন। সর্বপ্রথম এইখানে জাপানি সাংবাদিকের সঙ্গে কবির পরিচয় হল। আমেরিকান জার্নালিজম জাপানকে কতখানি আধুনিক করেছিল তার পরিচয় অচিরেই কবি ভালো করে পাবেন এখানে তার যেন একটা আভাস পেলেন। খানিক বাদে ক্যাপ্টেন এসে খবর দিলেন যে একজন জাপানি মহিলা কবির সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনিও সেই জাপানি সম্পাদকের মত কবিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, বহু কষ্টে কবি সেই অনুরোধ কাটালেও জাপানি মহিলার একগ্রো ইচ্ছাকে দমন না করে সিঙ্গাপুর নামার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কবিকে নামতে হল। জাপানি মহিলার অনুরোধ কবি মটরযানে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত রবারক্ষেত্র ও গ্রাম অঞ্চল দেখে এলেন। এরপর ৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালের দিকে তোসামারু জাহাজ চীন সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিল। হংকং চীনের প্রধান বন্দর, বন্দরে জাহাজ পৌঁছানো মাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি টেলিগ্রাম ও পত্র কপি পেলেন। বন্দরের জাহাজ থামলে ক্যাপ্টেন বললেন যে সাংহাই বন্দরে এই জাহাজ নামার কথা ছিল, কিন্তু জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাই আমাদের সদর অফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে অন্য বন্দরের বিলম্ব না করে চলে যেতে। হংকংয়ে জাহাজ দুদিনের থামলেও কবি দুদিনের জন্য শহরে নেমে হোটেলে থাকার প্রস্তাবের রাজি হলেন না। জাহাজের ডেকে বসে কবি কর্মব্যস্ত চীনা মজুরদের কাজ করতে দেখলেন এবং লিখলেন-

"কাজের শক্তি কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জিভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা। সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছেএই এত বড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? এখন যেসব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়।" (জাপানযাত্রী)

আশ্চর্য কবির এই ভবিষ্যৎবাণী যা পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়ে গেছে। চীনের সেই সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান কিভাবে চীনের জনজাতির জীবনবৈচিত্র্যকে বদলে দিল তার প্রমাণ আমরা প্রত্যেকেই পেয়েছি। অবশেষে জাহাজটি ২৯ মে বা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে জাপানের বন্দর কোবেতে পৌঁছল। যেখানে কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন তাইক্কান, কানসটা, সানো,কাওয়াগুচি প্রমুখ।তাইক্কান ছিলেন চিত্রকার, কানসটা একসময় কলকাতায় গিয়ে কবিদের অতিথি হন, সানো একসময় শান্তিনিকেতনে জুজুৎস শেখাতেন। কবি হংকং থেকে ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন বলে গুজরাটি বনিক মুরারজী বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। জাপানে কবি তিন মাস ছিলেন জাপানের কোবে বন্দর ও শিল্প নগরী অনেকটা ইংল্যান্ডের লিভারপুলের মত। জাপানের শহরের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে এ শহর রক্তমাংসের নয়, লোহা দিয়ে গড়া। তবে জাপানের শহরের চেহারায় জাপানি জাপানিরা ক্রমশ নিজেদের যেন সরিয়ে নিচ্ছেন। তবে জাপানের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন ওখানকার মেয়েরা, দরকারী সমস্ত কাজে তাদের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে। জাপানি চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ হলো সংযমবোধ। জাপানিদের নাচেরও যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, আরম্ভরতা জাপানিদের মধ্যে নেই, তাদের সংস্কৃতিতে যে সৌন্দর্য ভাবনার যথাযথ প্রকাশ পায় তার কথা রবীন্দ্রনাথ সেখানকার বিভিন্ন শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। জাপানি সংগীতেরও রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন, যা রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রী প্রবন্ধ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাষণের পর সেখানকার বিখ্যাত উয়েএনো পার্কে কবি প্রথম সংবর্ধনা জাপানি প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদ ও সচিবের সম্মেলনে কবিকে রাজকীয় অভ্যর্থনা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

জাভাযাত্রীর পত্র:

১৯২৭ সালের মে মাসের দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ের ছিলেন, সেখান থেকে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্র লেখেন যেখানে জাভা, বালিদ্বীপে যাবেন- এইরকম কথাবার্তা আলোচনা রয়েছে। এই পত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে কিছুকাল থেকেই দ্বীপাবলি যাওয়ার কথাবার্তা বিড়লাদের সঙ্গে চলছিল। আর এই জাভা দ্বীপে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা। জুন মাসের দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে কলকাতা ফিরলেন এবং এই সময়ে জাভাতে যাবার আয়োজন চলছিল। দানবীর ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ইতিপূর্বে যেমন চীন সফরের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন, এবারও তিনি জাভা যাত্রা করবার জন্য ১০ হাজার টাকা পাঠালেন। নারায়ণ দাস বিজয় নামে আরেকজন মারোয়ারী দানপতিও এক হাজার টাকা দিলেন। শ্রী ঘন স্যাম দাশ জানতে পেরেছিলেন যে বালিদ্বীপে হিন্দু ধর্ম ও জাভাদ্বীপে বৌদ্ধ স্থাপত্য ভাস্করাদী এখনো বিদ্যমান। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল ভারতের সঙ্গে এই দূর প্রাচ্যের বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধপূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা। চীন থেকে ফেরার পর কবি সে যাত্রার জন্য অন্যতম সঙ্গী কালিদাস নাগের চেষ্টায় কলকাতায় 'গ্রেটার ইন্ডিয়ান সোসাইটি' স্থাপিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এই বৃহত্তর ভারত পরিষদের প্রথম সভাপতি হন। যাই হোক ১২ই জুলাই কলকাতা থেকে রেলপথে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এবারে সঙ্গী হলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ কর ও অন্যতম অধ্যাপক তরুণ শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতিনিধি রূপে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ মালয় সফরে গেলেন, সেখানে রবীন্দ্র পরিচিত বন্ধু আরিয়ান ছিলেন, এখানে রবীন্দ্রনাথের যাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর কথা প্রচার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

মালয় সফরের পর রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর ভারত জাভা, বালিদ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। সেই জন্য তাঁর সাথে গেলেন মিস্টার বাকে ও তার পত্নী, আর এই যাত্রার যাবতীয় বর্ণনা আমরা পাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে ও রবীন্দ্রনাথের 'জাভা-যাত্রীর পত্র' নামক প্রবন্ধাবলীতে। ২০ জুলাই রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুর পৌঁছলেন, এখানে কবিকে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হলো। কবি সদস্যদের সম্মুখে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে চীনা ভাষা ও চীন দেশের বিদ্যায়তনে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন যে কতটা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা দিলেন। তিনি আরো বললেন যে বৌদ্ধ ধর্মের বন্ধনের জন্য চীনের প্রতি তার যে আকর্ষণ তা আংশিকভাবে সত্য, বৌদ্ধ ধর্ম নিরপেক্ষ চীনের বুনিয়াদি সংস্কৃতির যে সার্বভৌম মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত তার জন্য কবি চীনের প্রতি শ্রদ্ধা। এখানে ২৪ শে জুলাই সিঙ্গাপুরে অনেকগুলো সভা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথমে দুপুর বেলা প্যালেস গো থিয়েটারে চিনা শিক্ষক ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেন, এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চীনা কনসাল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে ভারতের প্রতি প্রাচীন চীনের আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা, তার সঙ্গে গত কয়েক বছর পূর্বে চীন দেশের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে তার কথা তুলে ধরলেন। যে সকল মহাপুরুষ চীন এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন তিনি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। সিঙ্গাপুরে তিনি সাত দিন কাটিয়ে ২৬ শে জুলাই কবি সদলে মালাক্কা যাত্রা করলেন, মালাক্কা বন্দরে কবিকে স্বাগত করবার জন্য স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও মালাক্কাবাসীদের প্রতিনিধি রূপে ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। পরের দিন মালাক্কা থেকে কবি চললেন মুয়ার বা বন্দর মহারানীর নামক স্থানে। এই বন্দর মালাক্কা প্রণালীর উপর মু-আর নদীর মোহনায় অবস্থিত। এটি জহর রাজ্যের প্রধান বন্দর, এখানেও কবি বক্তৃতা দিয়েছেন। সেখান থেকে কবি টাইপিং গেলেন, তারপর তিনান বন্দরে উপস্থিত হলেন। তবে এই মালয় উপদ্বীপ ভ্রমণের সবটাই নিছক প্রশংসা পূর্ণ নয়, মালয় ব্রিটিশদের খাস কলোনি,তেল খনি ও রাবার বাগিচার মালিকরা এদেশের শস্য ও শাসক, এখানে রবীন্দ্রনাথ ইম্পিরিয়ালিজম এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পিনাঙ বন্দর থেকে জাহাজে ১৬ ই আগস্ট বালি দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সারারাত্রি স্টিমার চলে ১৭ই আগস্ট জাহাজ পৌঁছলো সুমাত্রা দ্বীপের বেলাবানেতে, এখানে জাহাজ বদল করে জাভাগামী জাহাজ ধরতে হয়। ইন্দোনেশিয়ায় কবির সকল ব্যবস্থার জন্য মিস্টার বাকে ইতিপূর্বে এসেছিলেন, তিনিও বহু ডাচ ভদ্রলোক বন্দরে কবিকে স্বাগত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বন্দর ছেড়ে জাহাজ সিঙ্গাপুরে একদিনের জন্য থামল, সিঙ্গাপুরের পুরাতন বন্ধুদের অনেকেই কবির সঙ্গে জাহাজে এসে দেখা করে গেলেন, কবি কিন্তু ডাঙ্গায় নামলেন না। সিঙ্গাপুর থেকে ১৯ই আগস্ট প্লানসিউজ জাহাজ করে দুইদিন পরে জাহাজ ২১ই আগস্ট যবদ্বীপের বন্দর তাঞ্জোঙ প্রিওক পৌঁছল, এই জাহাজে বসেই রবীন্দ্রনাথ 'শ্রী বিজয় লক্ষ্মী' কবিতাটি লেখেন। জাভা দ্বীপের বন্দর তাঞ্জোঙ প্রিওক-এ কবি ও তাঁর সঙ্গীরা প্লানসিউজ জাহাজ থেকে নেমে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বাটাভিয়া নগরে মোটর যোগে গেলেন। এরপর কবি ও তাঁর সঙ্গীরা হোটেলে উঠলেন। সেই অপরাহ্নে কবির সম্বর্ধনা হল ও সন্ধ্যায় ইংরেজ কনসাল মিস্টার ক্রসবির বাড়িতে নৈশভোজ করেলেন।

বাটাভিয়া থেকে সেই অপরাহ্নে তাঞ্জোঙ প্রিওক ফিরে কবি ও তার সঙ্গীরা বালি দ্বীপগামী জাহাজে উঠলেন। ২৬শে আগস্ট বালি দ্বীপের বুলেলঙ পৌছালেন। কবির সঙ্গে ছিলেন সুনীতিকুমার, সুরেন্দ্র কর, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন ও অন্যান্যরা। বালি দ্বীপ ভারতের বাইরে একমাত্র দেশ যেখানে এখনো হিন্দুধর্ম জীবন্ত আছে। আদিবাসীরা শতকরা নব্বই জন হিন্দু। আশ্চর্যের বিষয় পার্শবর্তীদ্বীপ লম্বকের দশমাংস মাত্র হিন্দু আর সবাই মুসলমান। জাভা ও সুমাত্রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে বহুপূর্বে। কবি ও অন্যান্য সকলে চিন্তা মনিক নামক স্থানে বিশ্রাম নেওয়ার পর বাঙলিতে পৌঁছলেন। যেখানে গিয়ে দেখলেন এক রাজার বংশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে। পরে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করলে রাজা জানালেন যে কবির আগমনের পুণ্যে নাকি প্রজাদের মঙ্গল হবে। তুমি সফল হবে এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি করে রাজা কবির নিকট বিষ্ণুবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিলেন। রাত্রে কবির জন্য রাজা মুখোশপরা অভিনয় বা টপিং এর ব্যবস্থা করেন। মুখোশ নৃত্য ও অভিনয়ের রীতি আসামে উড়িষ্যায়, বাংলাদেশের পুরুলিয়া অঞ্চলে, আবার সুদূর চীন ও জাপানে দেখা যায়। মাঝখানে জাভা ও বালি দ্বীপে এই নিত্য দেখা যায়। এখানকার একটি বিষয় কবিকে বারবার মুগ্ধ করেছে সে হল প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে ও মানুষের আত্মসংযোগ। গিয়ানা রাজবাড়িতে অভিনয় চলাকালীন চারিদিকের লোকের অবারিত সমাগমে জনকলাহলপূর্ণ পরিবেশেও শিশুদের আর্তরবের পরিবর্তে নিরব থাকা কবিকে মুগ্ধ করে। এমনকি নারীস্ট্রের এমন সম্পূর্ণ নীরবতা ও কবি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছেন কবি। মনে পড়ে যায় কলকাতায় থিয়েটারে মেয়েদের কার্যকলাপ ও শিশুদের কান্নার। এখানকার দু একটি মেয়ের কোলে শিশুও কবি দেখেছেন কিন্তু তারা কাঁদলো না কেন সেটাই কবি নিকট বড় বিষয়, আরো একটি বিষয় দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছেন তা হলো এখানকার মেয়েদের অলংকারের বিরলতা ও স্বল্প থাকে, কখনো কখনো কোন কোন মেয়ের হাতের চুরি দেখা যায় তবে তাও সোনার নয়। "ছিদ্রকরা কানে সোনা রুপার গহনার পরিবর্তে ব্যবহার করেছে তালপাতার গুটি। এদের আর সকল কাজেই অলংকারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই....কেবল এদের মেয়েদের গায়ে গয়না নেই।"আরো একটি বিষয় কবি মনোযোগ সহকারে লক্ষ করেছেন তা হল আমাদের দেশে যেমন দেখা যায় শিল্পকর্ম তথা অলংকারাজির প্রধান রচনা স্থল দিল্লি আগ্রা ঢাকা মাদুরাই প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান প্রভাবজাত শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এখানে সেরকম বোধ হলো না, এখানে শিল্প কাজ সর্বত্র যেন ছড়ানো। এরপর এখানে তিন দিন মুন্ডুককে বসবাসের পর ৮ই সেপ্টেম্বর কবি বালি থেকে জাভা যাত্রা করার পরিকল্পনা করলেন। সেই মতো বেলা আটটা বাজলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ কর বাক্স তরঙ্গ গোছাতে লাগলেন এবং অবশেষে বন্দরের দিকে রওনা দিলেন। নিকটের পাহাড়ের ঘন সবুজ অরণ্য ও তার উপর সূর্যালোকে মিলিত হয়ে যেন কবির নিকট মায়াবী জগত সৃষ্টি করেছে। ঝর্ণা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনছে। সামনে পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস কবি দেখতে পাচ্ছেন বালিদ্বীপে পক্ষকাল কাটিয়ে কবি সদলে বন্দর থেকে জাভাযাত্রা করেন।

৯ই সেপ্টেম্বর (১৯২৭)জাভার অন্যতম বন্দর সুরবায়া পৌঁছে দেখেন জাহাজ-ঘাটে স্থানীয় ভারতীয়রা কবিকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত, এই জায়গাটি হচ্ছে বিদেশি সওদাগরের প্রধান আখড়া। জাভার সুরবায়া চিনি উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত স্থান, এই ছোট্ট দ্বীপটি থেকে দেশ-বিদেশে চিনি চালান করা হয়। সুরবায়াতে তিন দিন কবিরা সুরকর্তার রাজবংশেরএক রাজবাড়ীতে ছিলেন। রাজার ছেলের ওপর

অতিথি পরিচর্যার ভার পড়লে কবির মনে ভয় ছিল পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই অত্যাচার থেকে কবিরা রক্ষা পেয়েছিলেন। কারণ তাদের প্রাসাদের একটি অংশ কবিদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছি।ল জাভার সবচেয়ে বড় রাজপরিবার এই সুরকর্তায়। ওলন্দাজেরা এই রাজ পরিবারের প্রতাপকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু প্রতিপত্তি কাটতে পারেনি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে কবিরা আশ্রয় নিলেন এদের উপাধি মুংকুনগরো।

১৮ই সেপ্টেম্বর(১৯২৭)কবি সুরকর্তা ত্যাগ করে যোগ্যকর্তা অভিমুখে চললেন। তিন দিন যোগ্যকর্তায় থেকে কবি ও তার সঙ্গীরা অবশেষে বোরোবুদুরের স্তূপ দেখতে গেলেন। দেখার সময় কবি প্রথমেই দেখলেন যে ছোট ভেঙেচুরে যাওয়া মন্দিরকে এখানকার সরকার সারিয়ে দিয়েছে। গড়নটিকবির বেশ ভালো লেগেছিল, ভিতরে ছিল বুদ্ধের তিন ভাবের তিনটি মূর্তি। জাভার পালা শেষ করে কবি প্রত্যাবর্তনের পথে বাটাভিয়া জাকার্তা অভিমুখে চললেন, সেখানকার যে সরকারি জাহাজ সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা ছিল সেই জাহাজে খুব বেশি ভিড় থাকায় নিরুপায় হয়ে কবি, সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যরা একটি ছোট জাহাজে আশ্রয় নিলেন। কবি জাহাজ দুটি দিক ঘুরে যাবে তাই দু দিনের পথ তিনদিনের যেতে হবে। এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয়দের মূল সমস্যা যে কোথায় তা বিভিন্ন রচনায় বারবার ফুটে এসেছে। কবি সচেতন দৃষ্টি ও সঠিক বিচারবোধ কোনোভাবেই প্রধান সমস্যা গুলি এড়াতে পারেনি, যা আমাদের চোখে খুব সহজেই এড়িয়ে যায়।সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা কবি সেগুলি দর্শক ও পাঠক কুলের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এইভাবে কবি জাভা যাত্রার যাবতীয় বর্ণনার বৃত্তান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

রাশিয়ার চিঠি:

কবির জীবনের অন্যতম একটি অধ্যায় হল রাশিয়া ভ্রমণ, যার বৃত্তান্ত 'রাশিয়ার চিঠি'(১৯৩০) প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। রাশিয়াকে দেখার ইচ্ছা বহুকাল পূর্বে থেকেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের ১৯২৬ সালে নাগাদ যখন ভিয়েনা ছিলেন, তখন রাশিয়া থেকে তার নিমন্ত্রণ এলে শরীর খারাপের কারণে যাওয়া হয়নি, ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে ফিরে জাপান বাসকালে কোরিয়ার পরে সেখানে অর্থাৎ রাশিয়াতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাও সম্ভব হয় নি।এখানে যাওয়ায় কবির মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু রাশিয়া প্রত্যক্ষ করায় নয়, সেখানকার জনসাধারণকে কিভাবে ও কি পরিমানে অশিক্ষা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানাই কবির মূল আকর্ষন। রাশিয়া যাত্রায় কবি সহযোগী ছিলেন অমিয়কুমার চক্রবর্তী, আরিয়ান ও ডাক্তার হ্যারি টিম্বাস। ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কবি মস্কোয় পৌঁছালেন।

আমাদের দেশের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধানের উপায় হল শিক্ষা, রাশিয়ায় এই শিক্ষার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চোখে বেশি ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন যে, এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য উদ্যমে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কোন মানুষই যাতে নিঃস্ব হয়ে ও নিষ্কর্ম হয়ে না থাকে তার জন্য সর্বত্র প্রচুর আয়োজন ও বিপুল উদ্যমে কাজ করছে রাশিয়া। এ প্রসঙ্গে বলা চলে এই শিক্ষা শুধুমাত্র শ্বেত রাশিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ নয়, মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এই শিক্ষা কিভাবে বিস্তার লাভ করছে তা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। রাশিয়া গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে বেশি যে বিষয়টি ভালো

লেগেছে তা হলো সে দেশের ধনের গরিমার সম্পূর্ণ তিরোভাব, চাষাভুষা সকলে এখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তাতেই কবি ভীষণ আনন্দিত।রাশিয়ার বিপ্লব সাধিত হলো অনেক দিনের সাধনার ফলে, একদিনে কোনো বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না। ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল যেমন অসাম্যের তাড়নায় তেমনি রাশিয়া বিপ্লব ঘটে অসাম্যের অবসান ঘটাতে। তবে দুঃখের বিষয় ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্বের বাণী বেশি দিন টেকেনি। তবে রাশিয়াতে ব্যতিক্রম। কবি রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে অনেকেই কবিকে রাশিয়া ভ্রমণে বাধা দিয়েছিলেন এই বলে যে সেখানে যথেষ্ট আরামের অভাব, আহার বিহার এমনই মোটা রকমের যে কবির তা সহ্য হবে না, এমনকি কবিকে রাশিয়াতে যা দেখানো হবে তা সবই কৃত্রিম মুখোশ পরা। কিন্তু কবি একান্ত অভিপ্রায়ে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভারতবর্ষের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক মজুর শ্রেণীর মানুষদের কথা যেন বেশি করে মনে পড়ে এই রাশিয়া দেশটিতে এসে রবীন্দ্রনাথের। যৌবনের আরম্ভ কাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে কবি ওতপ্রোতভাবে পরিচয়। কবির নিকট সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ছিল এটাই তখনকার দিনে দেশে রাজনীতি নিয়ে যারা পল্লীবাসীদের ভারতবর্ষের লোক বলে মনে করেন না। তবে সেই দিন পার হয়ে গেছে সে পাবনা কনফারেন্স রাষ্ট্রনৈতিক নেতার সঙ্গে গভীর যে বাঁধনুবাদ হয়েছিল কবি যে চিন্তাশক্তির উদ্ভব হয়েছিল, তাই দেখতে পেলেন রাশিয়ায় ভ্রমনে এসে।

রাশিয়ায় জার শাসন শেষ হয় ১৯১৭ সালে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই ১৩ বছরের প্রতিমুহূর্তে এদের প্রচন্ড বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করে চলে আসছে, সোভিয়েত রাশিয়ার কর্মীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য কতটা কাজ করছে তার যাবতীয় সংবাদ কবি আত্মীয় পরিজনকে লিখে জানিয়েছেন। এদের যৌথ তথা ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থাও কবিকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করল। ইউক্রেন প্রদেশ থেকে আসা যুবক চাষি কবি প্রশ্নের উত্তরে কবিকে জানালেন যে ঐকত্রিক কৃষক ব্যবস্থায় তাকে প্রতিদিন আটঘণ্টা করে কাজ করতে হয় এবং প্রত্যেক সপ্তাহের পাঁচদিনে তাদের ছুটি এবং এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় সে পূর্ব থেকে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় মানুষেরা তিনটি জিনিস নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে তা হলো শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্র। এই তিনটি পথ দিয়েই মূলত এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন ও কর্ম সাধনাকে সম্পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করছে। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কাজ করছে তার ভাবক মনের নানা দিক, কবি এখানে সৌন্দর্য পিয়াসী বস্তুর সন্ধানেই রত ছিলেন, তিনি যথেষ্ট চিন্তাশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রাশিয়ার তৎকালীন সমাজ চিত্র অঙ্কন, সেইসঙ্গে সেখানের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের মর্মান্তিক চিত্রও তাঁর লেখনীতে বারবার ধরা পড়েছে। শিক্ষা বিষয়টিকে এরা নানা প্রণালীর মাধ্যমে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে- তার মধ্যে একটি মিউজিয়াম। নানা প্রকার মিউজিয়ামের জালে তারা সমস্ত গ্রাম ও শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। এখানে শিশুরা কেবল ব্যক্তিগত পরিবারের সম্পদ নয়, তারা রাষ্ট্রের সম্পদ। তাদের দায়ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, শিশুদের লালনপালনে যদি কোন রকম খামতি থেকে থাকে তবে রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গরা এসে শিশুর লালন পালনের তদারক করে থাকেন। যদি শিশুর লালন পালনে কোনরকম অসঙ্গতি দেখা যায় তবে শিশুকে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করে নেওয়া হয়ে থাকে। শিশু বলো, শিক্ষা বলো, শ্রমিক-কৃষক বলো, মজুর বলো- সমস্ত দিক থেকেই এদেশের সরকার সে দেশের মানুষের সার্বিক উন্নতিতে যে আত্মনিয়োগ তা ইউরোপীয় সভ্যতার কোন দেশে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পাননি। যার সার্বিক বিষয় রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ পুনরায় জাপান ও পারস্যের যাত্রা প্রসঙ্গ নিয়ে রচনা করেন 'জাপানে পারস্যে', 'ইরানে', প্রবন্ধগ্রন্থ। এইসবের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক বিভিন্নতা এবং মানবিক চেতনার বিস্তার লক্ষিত হয়। কোনো দেশে কালে তাঁর জীবনবোধ সংকীর্নতায় আবদ্ধ ছিল না, এই পৃথিবীর বৃহত্তর মানবিক জীবনের এক সমন্বিত সৌন্দর্যময় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই প্রবন্ধাবলীতে।

৩০৩.৩.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' অবলম্বনে লেখ।

২। শিক্ষা, কৃষি, যন্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সম্পর্কে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাশিয়ার চিঠি অবলম্বনে লেখ।

৩। জাপান যাত্রা কালের সামগ্রিক যাত্রা পথের বর্ণনা দাও।

৩০৩.৩.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

২। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

একক - ১৬

দার্শনিক সত্তা ও কবি সত্তার সম্মিলনে রবীন্দ্র জীবনের শেষ দশক (১৯৩০-১৯৪১)

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্ন

৩০৩.২.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

৩০৩.৩.১৬.১ : ভূমিকা

আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব সম্বন্ধে পত্র লেখার দিন ১৯৩০-এর ১০ই জানুয়ারি কবি বরোদার অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, আমেদাবাদ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। বরোদা যাত্রার পূর্বে কবি কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ বৎসরের অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করে। কবি জানতেন ভ্রমণ করে ফিরতে পারবেন না, তাই তাঁর ভাষণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠিয়ে দেন। এই বছরেই তিনি শেষবারের মতো ইউরোপ যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে যে ভাষণ দেন তা পরবর্তীকালে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর বক্তিতার মধ্যে ছিল ভারতের জনসমাজের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রয়েছে তার ব্যাখ্যা। তিনি এও বলেন ভারতের দুঃখের কারণ কী ও কেন? জীবন সৃষ্টি করে, যন্ত্র গড়ে, মানুষকে যখন যন্ত্র সাহায্য করে তখনই সে সার্থক। ইংল্যান্ড শেষ করে তিনি যাত্রা করেন জার্মানীতে। 'The Child' রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাব্য যা মূল ইংরেজিতে রচিত। পরে তা শিশুতীর্থে নতুন রূপ গ্রহণ করে। জার্মানী সফর সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন- "অনেক পূর্ব পরিচিত (১৯২১, ১৯২৬) জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জার্মানীর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠরভাবে ন্যাশনালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাইনে। ... দরিদ্রের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরী যেন দুর্গম হয়ে উঠেছে।"

বার্লিন থেকে কবি যাত্রা করেন উত্তর ইউরোপে। কোপেনহেগেন থাকাকালীন তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী' মুদ্রিতাকারে হাতে পান। জেনেভাতে তিনি আশ্রয় নেন মিস্ স্টোরির কাছে। এখানে এসেই তিনি ভারতের আইন অমান্য আন্দোলন ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অবগত হন। সরকার যে আইন অমান্য আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করতে চাইলেন তার কিছু বার্তা বিদেশে কবির কাছে পৌঁছায়। সোভিয়েত রাশিয়ায় কবির ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, আরিয়াম ও হ্যারি টিম্বার্স। মস্কো পৌঁছে কবই উঠলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। রাশিয়ায় গিয়েও উপলব্ধি করেন চিরকালই মানুষের সভ্যতার একদন লোক থাকে যারা সমাজের বাহন, কিন্তু তাদের মানুষ হবার সময় নেই। রাশিয়া ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা রয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধে।

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বার্লিন প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই এন্ড্রুজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রওনা হন। নিউইয়র্কে পৌঁছে বস্টনে বিশপ প্যাডকের আতিথ্য লাভ, তারপর নিউহ্যাভেন-এ। নিউইয়র্ক 'বিল্টমার হোটেল'এ পাঁচশো জন মিলে কবিকে অভ্যর্থনা জাজান। কবির সহিত এক মহিলা ভাস্করের গৃহে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হয়। নিউইয়র্ক ই বোস্টনে কবির চিত্র প্রদর্শণী হয়। এরপর কবি ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। লন্ডনে তখন প্রথম রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বসেছে। ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য কবিকে অনুরোধ করা হয়।

ইউরোপ-আমেরিকা সফর করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 'নবীন'-এর গান লেখা হয়। দোলপূর্ণিমার দিন 'নবীন' অভিনীত হয়। কবির জন্মোৎসবের ভাষণ- "একটি পরিচয় আমার আছে... আমি কবই মাত্র। আমি গুরু বা নেতা নই। আমি বিচিত্রের দূত। ... বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।" হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী তিক্ত সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা ও নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে। এই বছরেই 'গীতবিতান' দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের অবতারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কবি লিখেছিলেন—"যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।" 'The Child' নামে কাব্য এই সময়ে অনূদিত হয় 'শিশুতীর্থ' নামে। সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'আধুনিক সাহিত্য' গদ্য লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনাকে সমালোচনা করা হয়েছে। 'শাপমোচন'-এর অভিনয় হয়েছে ১৯৩১ সালে। কবির অঙ্কিত চিত্র এই বছরেই প্রথম ভারতে প্রদর্শিত হল। খড়দহে থাকাকালীন কবির মনে চিত্রের রূপ ভাবতরঙ্গ তুলেছিল। 'বিচিত্রতা' খন্ড কবিতার সংগ্রহ, যার মধ্যে ভাবের সাম্য নেই। কবিতার উপর ছবি আঁকার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১৯৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তনের সাত দিনের মধ্যে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে পুনের যারবেদা জেলে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনার জন্য রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী উৎসবের মেলা বন্ধ করে দেন। এই বছরেই স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে কবির বাণী গভর্মেন্ট কর্তৃক প্রেসে প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়। 'প্রশ্ন' কবিতার

মধ্যে দিয়ে কবির ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। গঙ্গাতীরে খড়দহের এক বাড়িতে নানা শিল্পী ও নিজের চিত্র সম্বন্ধিত রচনা 'বিচিত্রিতা' নন্দলাল বসুকে জন্মদিনে উৎসর্গ করেন। কবি ডাচ-এরোপ্লেন যোগে পারস্য ভ্রমণ করেন। আকাশ ভ্রমণকে স্মরণ করে 'পক্ষী মানব' কবিতা রচনা করেন। ভাইসরয় উইলিংডন ও গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে লেখেন- 'মানী', 'অগ্রদূত', 'শান্ত', 'প্রণাম' ইত্যাদি কবিতা।

পারস্যের রাজা রেজাশাহ পহলবির আমন্ত্রণে তিনি পারস্য যান। বাগদাদের পথে বগজবিনে প্রথম রাত, হামদান হয়ে দ্বিতীয় রাত কার্মানশাহে যাপন করে পরদিন পারস্য সীমান্ত পার হলেন। বাগদাদে বিপুল জনতা স্টেশনে কবিকে স্বাগত জানান। একদিন মরুভূমিতে বেদুইনের তাঁবুতে কবির নিমন্ত্রণ হয়। সেখানেই কবির জন্য রণণৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখেন। দারুণ অর্থসংকটের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক হন। তিনি রবীন্দ্র জন্মদিনে উৎসব উদযাপন ও কবিসংবর্ধনার অনুষ্ঠান করেন। কবি প্রথম মুক্ত ছন্দে গদ্যকবিতা রচনা করেন, যার নাম 'পুনশ্চ'। 'পুনশ্চে'র সব কবিতাই গদ্যে রচিত। আবার 'রথযাত্রা' নাটককে সংশোধন করে 'রথের রশি' নাম দেন। 'শিবের দীক্ষা' নতুন করে নাম হয় 'কবির দীক্ষা'। সভ্যতার রথ চলে আসছে, কিন্তু আজ তা হঠাৎই অচল। সমাজের অচ্ছুতের দলই রথের রশি টানে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে ছন্দের জোর। এগুলো একত্রে নাম দেন 'কালের যাত্রা'।

গান্ধীজী অনশন গ্রহণ করলে কবি শান্তিনিকেতনে সর্বশ্রেণীর ব্রাহ্মসমক্ষে ভাষণ দেন। গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গকালে কবি সেকাহ্নে উপস্থিত ছিলেন, এবং গান্ধীজীর প্রিয় গান—"জীবন যখন শুকায়ে যায়" গাইলেন কবি। শান্তিনিকেতনে বসে কবি এই বছরেই 'শেষ সপ্তক'-এর কবিতাগুলি রচনা করেন। 'দুইবোন' নামে একটি গল্প আগষ্ট মাসে যে খসড়া করেছিলেন, সেটি মাজাঘষা করে প্রকাশের উপযুক্ত করলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল। ডিসেম্বরের গোড়ায় কবি কলকাতায় এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে তাঁকে ভাষণ দিতে হয়। ভাষণের বিষয় ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কবি ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে পুনরায় কলকাতায় আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা লেকচার' হলে বক্তৃতা দিতে হয়। কবি সিনেট হলে 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। যা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থখানিতে। এটি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার শেষ গ্রন্থ। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ধর্মভাবনার নির্গলিত রূপ, রচনার শৈলীতেও তা অপরূপ। তাঁর ধর্মদেশনা সাহিত্য 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'পরিচয়' ও 'সঞ্চয়'-এর মধ্যে কিয়দংশ সংগৃহীত হয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ এই সকল ভাবনার সারমর্ম—সমস্ত জীবনের ধ্যান মন্থনজাত কৌস্তভমণি সদৃশ।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করে ইংরেজিতে ভাষণ পাঠ করেন, যা 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে পরিচিত। এই বছরেই কবি 'শাপমোচন' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কবি এবছরে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতনে আগমণ ঘটান। কবি এবছরে বিখ্যাত নাটক 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' রচনা করেন। কোলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও

শিক্ষকদের দিয়ে অভিনীত হয়। বোম্বাই-এ বিচিত্র অনুষ্ঠানে 'তাসের দেশ' অভিনীত হয়। কবি এসময়ে হায়দ্রাবাদে যান। অসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। 'বাঁশরী' নাটকটিও এই সময়ে রচনা।

কলকাতায় ফিরে কবি রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে 'ভারত পথিক রামমোহন' নামে ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসে রামমোহনের যথার্থ স্ত্যহাঙ্কোথায় তাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইহাই তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ বক্তৃতা। কবি ১৯৩৪ সালের জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে ফরলেন পৌষের উৎসবে, কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের দুই দিন পর সরোজিনী নাইডু আশ্রমে আসেন। জহরলাল নেহেরু ও কমলা নেহেরু তাদের একমাত্র কন্যা ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হিসেবে ভর্তি করেন। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে মেয়র নীহাররঞ্জন সরকার প্রধান অতিথিরূপে আসেন। কবি ভাষণ দেন 'উপেক্ষিত পল্লী' নামে। এরপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্যতত্ত্ব' বিষয়ে তা ভাষণ দেন, তা বহু প্রতিষ্ঠানকে আলোয়িত করে।

শান্তিনিকেতনে কবি 'বিথিকা' কাব্যের ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় ব্রতী হন। শান্তিনিকেতনে 'শাপমোচন' অভিনীত হয়। কানডিতে বসে শেষ করেন 'চার অধ্যায়'এর মতো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে বক্তৃতা দেন 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক বিষয়ে, যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মালঞ্চে'র মতো উপন্যাসও এই সময়েই রচনা।

কলকাতার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও নিখিল বঙ্গসঙ্গীত সম্মেলন উদবোধন করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। রবীন্দ্রনাথ কখনই চাননি বাংলা দ্বিখণ্ডিত হোক, কারণ তিনি জানতেন- "ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ- সেই যোগ একেবারে বিছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয় বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়।" কবির মন এই সময় ক্রমেই সংস্কারাবদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে সরে যাচ্ছিলতার অন্যতম প্রমাণ বীথিকা কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটি। কবিতাটির মধ্যে কবির নিগূঢ় সমাজতান্ত্রিক ভাব মূর্ত হয়েছে। অকুলীন বণিক সমাজের বণিকবৃত্তি তাঁকে ক্লিষ্ট করেছে তাও স্পষ্ট হয়। এই সময় কবি 'পলাতকা' কবিতাটি যেখানে তাঁর দৌহিত্রী নন্দিতার কথা স্পষ্ট হয়েছে। এই বছরই কবি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যান। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়া ও জমাতা কুলপ্রসাদ সেনকে 'পরিণয় মঙ্গল' কবিতাটি উপহার দেন যেটি মূলত নাতিদীর্ঘ কৌতুক হাস্যপূর্ণ কবিতা এলাহাবাদে থাকাকালীন কবির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। লাহোরে থাকাকালীন ছবি আঁকায় মনোযোগ দেন। ছন্দনামা বাধারাণীকে কবি পত্রের উত্তরে লেখেন 'আধুনিকা' কবিতা।

উত্তর ভারত ঘুরে কবি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর মাটির বাড়ি শ্যামলী নির্মিত হয়। এখানে বসেই কবি শেষ সপ্তকের গদ্য ছন্দের কবিতা লিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এই বছরেই। প্রাতকালে আম্রকুঞ্জে এই উৎসব সেখানে কবি 'ফাল্গুনী' নাটক থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন। ৭৪তম জন্মোৎসবে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে গদ্য কবিতায় লিখিত একটি পত্রে পাওয়া যায়-

"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে

জন্মদিনের ধারাকে বহন করে

মৃত্যুদিনের দিকে।" (শেষসপ্তক, ৪৩ সংখ্যক)

-এই জন্মদিনেই প্রকাশিত হল কবির 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থ। পুরানো কবিতা ভেঙে গদ্য ছন্দে নতুন রূপদিতে পরীক্ষা করেছেন এখানে। বার্ধক্যজনিত ক্লান্ত দেহ, অবসর জীবনের মধ্যে মনের মতো অনুকূল পারিপার্শকের মন যখন নিজের দিকে দেখতে চায় তখনই এই কবিতাগুলি রচিত। কাব্যটি আত্মকাহিনী ও আত্মচিন্তা বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যেন প্রতিদিনের ভাবনার নিবেদন, যেন দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমন্বিত সমন্বিত হয়ে একটি জীবন দর্শণ সৃষ্টি করেছে।

গ্রীষ্মাবকাশে কবি নদীবক্ষে আরোহণ করেন, এখানে বসেই কবি বীথিকার কবিতাগুলি নিয়ে ভাবনায় রত হন। শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিখা পদ্ধতি স্পষতভাবে ও সঙ্ঘতাকারে লিপিবদ্ধ করেন 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষার মূলতত্ত্ব এখানে আলচিত হয়েছে। চন্দন্নগরের নদীবক্ষে যে কাব্যধারা উৎসারিত হয় তাই-ই শান্তিনিকেতনে ফিরে 'বীথিকা'য় রূপ পায়। কবি কবিতাগুলির মধ্যে আঙ্গিকের যোগ নেই, বিচ্ছিন্ন দিনের কবিমনের ভাবনা মাত্র। তবে এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও রয়েছে স্বতন্ত্র সৃষ্টির মালা যা ফল্গুনদীর মতোই অন্তঃশলিলা। শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে চারটি গানও চরিত হয়।

পূজাবকাশে বিদ্যালয় দুটি হলে রবীন্দ্রনাথের দিন কাটে কবিতার কাটাকাটিতে। শরতের রৌদ্রছায়াময়ী শোভা দেখে ধরণীর এই অখণ্ড বিচিত্র রূপটি কবির মনে বিকশিত হয়, যা থেকেই কবি লেখেন 'পৃথিবী' কবিতাটি। 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলি কবির বিচ্ছিন্ন ভাব ধারারই বহিঃপ্রকাশ। 'পৃথিবী' থেকে 'দেহাতীত' লোক পর্যন্ত জীবের প্রয়াণ স্বাভাবিক স্থল থেকে সূক্ষ্মতর লোকে গতি। রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই 'শব্দতত্ত্ব' নতুন ভাবধারা নিয়ে প্রকাশ পায় 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'। ভাষা বিষয়ক যেসব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তারই নতুন সংযোজন।

১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় শিক্ষা-সপ্তাহে ও নবশিক্ষা সংঘ-এর উদ্বোধন সভায় বক্তৃতা দেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কবি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' ও 'শিক্ষার সঙ্গীত' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই শিক্ষাসপ্তাহে তিনি ইংরাজিতে বিশ্বভারতী কেন স্থাপন করেন ও তার অন্তর্নিহিত বাণী কী সে বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে 'পঞ্চভূত'কে নতুনভাবে প্রকাশের আয়োজন করেন, নাম দেন 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। কবি উপলব্ধি করেছিলেন নাট্যকাব্যই নৃত্যনাট্য হওয়ার জন্য উপযুক্ত। তাই নৃত্যছন্দে সংগীতকে রূপ দেবার জন্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করলেন। এম্পায়ার থিয়েটারে এই বছরই পরপর তিনদিন চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হয়। নাটকটি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান নগরে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর বছর বয়সে বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর ভারত যাত্রা করেছিলেন। পাটনায় দুই রাত্রি, এলাহাবাদে এক রাত্রি। লাহোরে পরপর দুই দিন, দিল্লীর রিগ্যাল থিয়েটারে দুদিন, মিরাটে একদিন চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হয়।

এই বছর কবি জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি পাঠ করেন। কবিতাটিতে অনেক কথা, অনেক অভিযোগ, অনেক তত্ত্ব আছে, যা পাঠ করলে কবির বিষাদঘন মনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। 'পত্রপুটে' কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা গভীরভাবে অধ্যয়নের উপযোগী। এখানে নিজের জীবনের কথাই যেন ব্যক্ত

করেছেন, ব্যক্ত করেছেন অন্তরের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, আদর্শের কথা। কবিকে কখনো উপেক্ষা করেনি নারী, তিনিও কখনো উপেক্ষা করেননি নারীকে। কবির কাছে অবিচ্ছিন্ন নারীমূর্তি চিরকাল নানা প্রতীকে রূপ নিয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। যুগান্তর থেকে কবি ও শিল্পীর ধ্যানের ও রূপায়নের বিষয় নারী, চিরদিনই সে তথাকথিত সংসার অনাসক্ত বীতকাম বৈরাগীর উপেক্ষার পাত্রী, 'নেতি-নেতি'র দ্বারা অস্বীকৃত। তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে মোহিনী শক্তি আসা যাওয়া করে। কবির জীবনে ও সাহিত্যে নারী যে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে তা 'পত্রপুট'-এর কবিতা স্পষ্ট হয়েছে। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র সন্তান নন্দিতার বিবাহ উপলক্ষে 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থটি নবদম্পতিকে আশির্বাদ স্বরূপ উপহার দেন।

বাইরের ঘটনা যেমনই চলুক না কেন কবির কাব্য ধারার পথ কেটে আপন মনে বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতন, বরাহনগর দুই স্থানের মিলনেই প্রকাশ পায় 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো। চিরপুরাতন-চিরনবীনা ঊর্বশীর উদ্দেশেই কবিতাগুলি মুক্তি পেয়েছে, কখনো গদ্য লিরিক রূপে, কখনও কথিকা রূপে। আসলে কবির শেষ জীবনের বহু কবিতা ও গানের মধ্যে কৈশোরের 'যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ' ছিল তা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ছন্দ বিষয়ে কবি বলেছিলেন- "বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।" 'ছন্দ' প্রবন্ধে বাংলা ছন্দ বিষয়ে আলোচনা পূর্ব অপেক্ষা অনেকখানি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তার দীর্ঘ ভূমিকা অংশে ছন্দ ও নৃত্য সম্বন্ধে তিনি যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার অন্যতম কথা। এই সময় কবির 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়।

'পরিশোধ' নাটক অভিনয়ের পর ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কবি শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁর 'সে' ও 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস-এর জন্য তিনি লেখেন—"চলো যাই, চলো যাই" গানটি। অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধে আফ্রিকার ইতিহাস সমৃদ্ধ হতভাগ্য কৃষ্ণকায় মানুষদের প্রতি শ্বেতকায় সভ্যমানুষের অত্যাচারকে সামনে রেখে 'আফ্রিকা' কবিতাটি রচনা করলেন। কবি আলমোড়াতে থাকাকালীন লেখেন 'ছড়ার ছবি', 'বিশ্বপরিচয়'। আলমোড়া আসার সময় কবি নন্দলাল বসুর অঙ্কিত বেশকিছু স্কেচ সঙ্গে এনেছিলেন, সেগুলিকে কেন্দ্র করেই 'ছড়ার ছবি' কবিতাগুলি লিখেছিলেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অপরাধীর যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকালের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হত। এই বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য কোলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার সভাপতি। সেখানে তিনি এইরূপ শাস্তির বিরোধীতা করেন। ১৪ই আগষ্ট বাংলাদেশে 'আন্দামান দিবস' বলে ঘোষিত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীগণ এই দিন উদযাপন করার জন্য সভা আহ্বান করেন। এইসময় রবীন্দ্রনাথ কেন কিছু গান লেখেন, যেগুলোর মধ্যে সুরময় ছোঁয়ায় প্রেমিক হৃদয়ের মধুময় রূপ লক্ষিত হয়েছে।

কোলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি অসুস্থ হন। এই অসুস্থতার সংবাদ তড়িৎ বার্তায় প্রচারিত হল। কবির আশ্চর্য জীবনীশক্তি ছিল বলেও দুদিন হতচৈতন্য থাকার পরও এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে

ওঠেন। মৃত্যু যবনিকার তোরণ থেকে অজানার যেটুকু আভাস পেয়েছিলেন তাই-ই ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হল নতুন কবিতা, যেগুলি 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের মধ্যেকালের সামান্য ব্যবধান থাকাতেই কবিতাগুলি নানা তত্ত্বে পূর্ণ হয়েছিল, যা হয়তো সম্ভব হত না কালের দূরত্বে। কিন্তু "কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা, ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো।"

নববর্ষের ভাষণে কবি জীবন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অভাবনীয় অনুভূতির কথা বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রান্তিক আলোচনা প্রসঙ্গে। অসুস্থতার কারণে ভূমিকার অভাবে 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশ পেতেও বেশ দেরি হয়েছে। দীর্ঘ উৎসর্গ পত্রে কবি বিশ্বপরিচয় কেন লখেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশ্বপরিচয় পড়তে গিয়ে সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবিকে আমরা উপলব্ধি কবি।

কোলকাতায় নবশিক্ষা সংঘ-এর সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধায় যে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেন তার যথাযথ কার্যকরী করতে শান্তিনিকেতনে নবশিক্ষা সংঘের সদস্যরা আসেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করেছিলেন। গান্ধীজী শিক্ষাসত্রের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে লক্ষ্য করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জীবিকা হইতে জীবন, গান্ধীজীর আদর্শ জীবন হইতে জীবিকা। কবি এই সময় 'মুক্তির উপায়' গল্পের নাট্যরূপ দান করেন। পাশাপাশি 'পথে ও পথের প্রান্তে' নামক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পসত্তারবহুরূপিকাতে স্পষ্টরূপে ধরা দেয়।

কবি রবীন্দ্রনাথের শরীর ভেঙে গেলেও মন তাঁর সদাই জাগ্রত ছিল। ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দি ভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এন্ড্রুজ সাহেব তাঁর জায়গায় পৌরোহিত্য করেন। হাজারিপ্রসাদ শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে সংস্কৃত ও হিন্দি শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পের হিন্দি অনুবাদ করেন। হিন্দি ভবনের উদ্বোধনের দিন কবি ঘরে বসে কবিতা লেখেন। এই সময়ই তাঁর 'গীতবিতান'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'চণ্ডালিকা' নাটককে গানময় নৃত্যময় করে নতুন রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকে দুটি দিক রয়েছে- সাহিত্যিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক, অন্যটি আর্টের। কবি এই মনস্তাত্ত্বিক দিককে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করতে গিয়ে অনেক গ্রহণ-বর্জন করেন।

নববর্ষের দিনে কবির মন আন্তর্জাতিক ঘনায়মান জটিলতার জন্য অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব, হিটলার ও মুসোলিনীর ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার শমিত করার জন্য চলেছে তোষণ নীতি। অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখেছিলেন—"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হল।"(প্রান্তিক) এই বছর কবি 'জন্মদিন' কবিতাটি রচনা করেন। কাব্যে তত্ত্বের দিক থেকে কবিতাটি অনবদ্য, সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বেদনা থেকে উৎসারিত। কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে বিশ্বমানবের দুঃখে উদ্গীত রুদ্ধন্ট্রের বাণী। কালিম্পঙে থাকাকালীন 'বাংলা ভাষণ পরিচয়' নামে একটি প্রবন্ধগন্থ রচনা করেন।

সানাই-এ 'অধীরা' কবিতা রচনার ইতিহাস 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর মধ্যে বিবৃত আছে। মংপু ত্যাগের আগে কবি লেখেন 'মংপু পাহাড়' কবিতাটি। কালিম্পঙে লেখা তাঁর তিনটি কবিতা- 'অদেয়', 'যক্ষ', 'মায়া' -সব কটিই 'সানাই' কাব্যগন্থে গৃহীত হয়েছে। 'যক্ষ' কবিতায় কবি বিরহিনী যক্ষিণীর কথা বলেছেন। কালিম্পঙ ও মংপুতে ভ্রমণ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ 'ইস্‌টেশন' নামে একটি কবিতা লেখেন, যা আলমোড়ায় লেখা ছোট একটি কবিতার ব্যাপক রূপ। পাহাড় থেকে ফিরে কবির সঞ্চিত ছোটখাটো কবিতাগুলিকেও একত্রিত করে 'সেঁজুতি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

দিন যায়, বাইরের কাজ যা পারেন আপনমনে করে চলেন, সাধ্যমত পড়াশোনাও চলে, যদিও চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হতে শুরু করে এই সময় থেকে। 'সেঁজুতি' ছাপার পর নতুন কবিতা লেখা শুরু করেন, যার প্রথম কবিতা 'আকাশ প্রদীপ'। ইউরোপ, চীন, ইথিওপিয়া, জাপান ও ইতালির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার আলোকে কবি লেখেন 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা। 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশ' নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। কোলকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্র-ছাত্রীর দল কোলকাতায় যাত্রা করে। নাটকগুলি সার্থকভাবে অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের জন্য কবি নতুন গান রচনা করেন এবং পুরানো কবিতায় সুর দিলেন বেশ কিছু। এই সময় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোভাবকে কবি সমর্থন করতে পারলেন না। অমিয়চন্দ্রকে কবি লিখেছিলেন- "অবশেষে আজ, এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতর নিঃসংকোচ হয় ঘোষণা শোনা গেল। ...স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদিতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।" কবি এই সময় লেখেন 'প্রজাপতি' ও 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' কবিতা।

নববর্ষের পর কবি গেলেন পুরীতে, উড়িষ্যায় এককালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারী ছিল বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উড়িষ্যার সম্বন্ধ বহুকালের। পুরীতে পৌঁছে তিনি 'প্রবাসী' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতায় সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতজনিত বেদনা স্পষ্ট হয়েছে। পুরীতে থাকাকালীন তাঁর লেখা অন্যান্য কবিতা 'এপারে ওপারে', 'অত্যুক্তি'। এরপর কবি মংপুতে যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে কেবলমাত্র আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলারূপেও তার বিচার করেন, সেজন্যই তাঁর কাছে কাব্যপ্রসাধন কাব্যসাধনারই সমতুল্য। নবজাতকের 'সাড়ে নটা', 'সানাই'-এর 'মানসী' কবিতা দ্বয়ের ইতিহাস এই মংপু থেকেই পাওয়া যায়। মংপু থেকে শান্তিনিকেতন ফিরে 'রচনাবলী'র জন্য ভূমিকা লেখেন, এই বছরেই প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা ও কবির 'দেশনায়ক' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

এরপর তিনি আবার দুমাসের জন্য মংপুতে যান। সেখানে কবিতা লেখা, ছবি আঁকার পাশাপাশি তাঁর বিখ্যাত তিন সঙ্গীর গল্প 'শেষকথা' রচনা করেন। গল্পটির অপূর্ব রচনা কুশলতা, তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অনিবার্য মহিমা লাভ করেছে। এরপর মেদিনীপুর যাত্রা করেন। কোলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগ খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রদর্শণীর উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন। এই পর্বে কবি 'পথের সঞ্চয়' নামে একটি প্রবন্ধও রচনা করেন। স্থির হয়ে বসে থাকা কবির ভাগ্যে নেই, স্বভাবেও নেই। আশি বছর বয়সেও তাঁকে ঘুরে বেড়াতে

হয়েছে এখানে সেখানে। ১৯৪০ সালে কবি সিউড়ি ও বাঁকুড়ায় যান প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য। বসন্ত উৎসবের জন্য 'অস্পষ্ট' নামক কবিতার অবতারণা, যেখানে অবচেতনার আমেজ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আসলে কবি মনে করতেন জীবনের অনেক কিছুই থেকে যায় অস্পষ্ট। গত কয়েক বছরের মধ্যে লিখিত অথচ কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি এ শ্রেণীর বহু জমানো কবিতা নিয়ে। বিচিত্র ভাবের যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে তার কোনো স্পষ্ট ভাব লক্ষিত হবে না একথা উপলব্ধি করেই অমিয় চক্রবর্তীর সাহায্যে দু'খানা কাব্যগ্রন্থে নির্বাচিত করা হয়। এই কাব্যদুটির নাম 'নবজাতক' ও 'সানাই'। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে মৃত্যু দূরে চলে যায়, বরং নতুন সূর্যোদয়ের কথা রয়েছে। আসলে কাব্যের ঋতু পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে। তাই পূর্বের মৃত্যুভাবনা এখানে নেই। আবার 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও এই সময়ে রচনা। কবির এই ছড়ার সূত্রপাত হয় 'খাপছাড়া' ও 'সে'র মধ্যে। তারপর 'ছড়ার ছবি', 'প্রবাসিনী'র মধ্যে দিয়ে চলে হাসি ও গল্পের কবি প্রলাপ, 'গল্পে গল্পে' তার শেষ।

কালিম্পঙে কবি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় আত্মীয়রা তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে আসেন। প্রায় দু'মাস কবি শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময় কবি রচনা করেন 'রোগশয্যা'র কবিতাগুলি। মাঘ উৎসবে কবির শেষ ভাষণ আরোগ্য মন্দিরে পঠিত হয়। রোগশয্যায় দিন যায়, কখনও কেদারায়, কখনও বিছানায়। রাত্রি কাটে কখনও অনিদ্রায়, কখনো বিচিত্র ভাবনায়। এর মধ্যেই চলে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি- কোনটি গম্ভীর, কোনটি লঘু, কোনটি গদ্য, কোনটি পদ্য।

৩০৩.৩.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্ন

১। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। পুনশ্চ কাব্যের গদ্যকবিতায় কবির সমকালীন জীবনের নিদর্শন রয়েছে আলোচনা করো।

৩। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তা এই পর্বে এসে পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার প্রকাশ—এ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৩০৩.৩.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ — সত্যেন্দ্রনাথ রায়।